তিন গোয়েন্দা সিরিজ

তিন গোয়েন্দা

রকিব হাসান

Scanned by: Shabab Mustafa

Send your feedback at:
Shabab.mustafa@gmail.com

তিন গোয়েন্দা

প্রথম প্রকাশঃ আগস্ট ১৯৮৫

রকি বীচ, লস অ্যাঞ্জেলেস, ক্যালিফোর্নিয়া।

সাইকেলটা স্ট্যাণ্ডে তুলে রেখে ঘরে এসে ঢুকল রবিন মিলফোর্ড। গোলগাল চেহারা। বাদামী চুল। বেঁটেখাট এক আমেরিকান কিশোর।

'রবিন, এলি?' শব্দ শুনে রান্নাঘর থেকে ডাকলেন মিসেস মিলফোর্ড।

'হ্যাঁ, মা,' সাড়া দিল রবিন। উঁকি দিল রান্নাঘরের দরজায়। 'কিছু বলবে?'

চেহারায় অনেক মিল মা আর ছেলের। চুলের রঙও এক। কেক বানাচ্ছেন মিসেস মিলফোর্ড। 'চাকরি কেমন লাগছে?'

'ভালই,' বলল রবিন। 'কাজকর্ম তেমন নেই। বই ফেরত দিয়ে যায় পাঠকরা। নাম্বার দেখে জায়গামত ওগুলো তুলে রাখা, ব্যস। পড়াশোনার প্রচুর সুযোগ আছে।'

'কিশোর ফোন করেছিল,' একটা কাঠের বোর্ডে কেক সাজিয়ে রাখতে রাখতে বললেন মা।

'কি, কি বলেছে?'

'একটা মেসেজ দিতে বলেছে তোকে।'

'মেসেজ! কি মেসেজ?'

'বুঝলাম না। আমার অ্যাপ্রনের পকেটে আছে।'

'দাও,' হাত বাড়াল রবিন।

'একটু দাঁড়া। হাতের কাজটা সেরেই দিচ্ছি,' বড় দেখে একটা কেক তুলে নিলেন মা। ছেলের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'নে, খেয়ে নে এটা। নিশ্চয় খিদে পেয়েছে।'

কেকটা নিয়েই কামড় বসাল রবিন।

'হ্যাঁরে, রবিন, রোলস রয়েস তো পেলি...'

'শুনেছ তাহলে। আমি না, কিশোর পেয়েছে,' কেক চিবুতে চিবুতে বলল রবিন। 'চেষ্টা করেছিলাম, হয়নি। একশো আশিটা বেশি বলে ফেলেছিলাম, মুসা দু'শো দশটা কম।'

'ওই হল! কিশোরের পাওয়া মানেই তোদেরও পাওয়া।...রবিন, প্রতি-

যোগিতাটা কি ছিল রে?'

'জান না?' চিবানো কেকটুকু কোঁৎ করে গিলে নিয়ে বলল রবিন, 'সে এক কাণ্ড! বড় এক জারে শীমের বীচি ভরে শোরুমের জানালায় রেখে দিয়েছিল কোম্পানি…'

'রেন্ট-আ-রাইড অটো রেন্টাল কোম্পানি?'

'হ্যাঁ। ঘোষণা করলঃ জারে ক'টা বীচি আছে যে বলতে পারবে, শোফারসহ একটা রোলসরয়েস দিয়ে দেয়া হবে তাকে তিরিশ দিনের জন্যে। সব খরচ-খরচা কোম্পানির। জারটা দেখে ঝটপট আন্দাজে সাবমিট করে দিয়ে এলাম আমি আর মুসা। কিশোর তা করল না। জারটা ভাল করে দেখল, এদিক থেকে ওদিক থেকে। বাড়ি ফিরে এল। শুরু করল হিসেব। কত বড় জার, বীচির সাইজ, প্রতিটা বীচি কতখানি জায়গা দখল করে, ইত্যাদি ইত্যাদি। তিনটে দিন শুধু ওই নিয়েই রইল।…তার উত্তরও পুরোপুরি সঠিক হয়নি, তিনটে বেশি। তবে এরচেয়ে কাছাকাছি আর কারও হয়নি। কিশোরের জবাবকেই সঠিক ধরে নিয়েছে কোম্পানি,' আবার কেকে কামড় বসাল রবিন।

'ছুটি তাহলে খুব আনন্দেই কাটছে তোদের,' একটা কাপড়ে হাত মুছছেন মা। 'কোথায় কোথায় যাচ্ছিস?'

'সেটা নিয়েই ভাবছি,' বাকি কেকটুকু মুখে পুরে দিল রবিন।

'আরেকটা নিবি?'

মাথা নাড়ল রবিন। হাত বাড়াল, 'মেসেজটা, মা?'

পকেট থেকে কাগজের টুকরোটা বের করলেন মিসেস মিলফোর্ড। ইংরেজিতে বানান করে করে বলেছে কিশোর, লিখে নিয়েছেন তিনি। পড়লেন, 'সাবুজ ফাটাক য়েক! ছ্যাপা খ্যানা চালু! মানে কি রে এর?'

'সবুজ ফটক এক দিয়ে ঢুকতে হবে। ছাপাখানা চালু হয়ে গেছে,' বলতে বলতেই ঘুরে দাঁড়াল রবিন। রওনা হয়ে গেল দরজার দিকে।

'ও-মা, এই এলি! আর এখুনি…,' থেমে গেলেন মা। বেরিয়ে গেছে রবিন। কাঁধ ঝাঁকালেন তিনি।

এক ছুটে হলরুম পেরোল রবিন। দরজা খুলে প্রায় ছিটকে বেরিয়ে এল বাইরে। ধাক্কা দিয়ে স্ট্যাণ্ড সরিয়েই এক লাফে সাইকেলে চড়ে বসল। পা ভাঙা, ভুলেই গেছে যেন।

ব্যথা আর তেমন পায় না এখন। সাইকেল চালাতেও বিশেষ অসুবিধে হয় না। পাহাড়ে চড়তে গিয়ে ঘটিয়েছে ঘটনাটা। ভাঙা জায়গায় ব্রেস লাগিয়ে দিয়েছেন ডাক্তার আলমানজু। অভয় দিয়েছেন, শিগগিরই ঠিক হয়ে যাবে পা।

ছোট্ট ছিমছাম শহর রকি বীচ। একপাশে প্রশান্ত মহাসাগর, অন্যপাশে সান্তা মনিকা পর্বতমালা।

পর্বত বললে বাড়িয়ে বলা হয় সান্তা মনিকাকে, পাহাড় বললে কম হয়ে যায়। ওরই একটাতে চড়তে গিয়ে বিপত্তি ঘটিয়েছে রবিন। বেশ খাড়া। সাধারণত কেউ চড়তে যায় না। বাজি ধরে ওটাতেই চড়তে গেল সে। পাঁচশো ফুট উঠেছিল কোনমতে, তারপরই পা পিছলাল।

শহরতলীর প্রান্ত ছাড়িয়ে এল রবিন। ওই যে, দেখা যাচ্ছে জাংক-ইয়ার্ডটা। পাশা স্যালভিজ ইয়ার্ড।

দুই ভাই জাহেদ পাশা আর রাশেদ পাশা। বাঙালী। গড়ে তুলেছেন ওই জাংক-ইয়ার্ড। আগে নাম ছিলঃ পাশা বাতিল মালের আড়ত। ইংরেজি অক্ষরে সাইনবোর্ড লাগানো হয়েছিল বাংলা নামের। সঠিক উচ্চারণ কেউই করতে পারত না, খালি বিকৃত উচ্চারণ। রেগেমেগে শেষে নামটা বদলাতে বাধ্য হয়েছেন রাশেদ পাশা, কিশোরের চাচা।

এখন রাশেদপাশা একাই চালান স্যালভিজ ইয়ার্ড। ভাই নেই। ভাবীও নেই, দু'জনেই মারা গেছেন এক মোটর-দুর্ঘটনায়। হলিউড থেকে ফিরছিলেন রাতের বেলা। পাহাড়ী পথ। কেন যে ব্যালান্স হারিয়েছিল গাড়িটা, জানা যায়নি। নিচের গভীর খাদে পড়ে চুরমার হয়ে গিয়েছিল। কিশোরের বয়েস তখন এই বছর সাতেক।

অনেক কিছুই পাওয়া যায় পাশা স্যালভিজ ইয়ার্ডে, তবে সবই পুরানো। আলপিন থেকে শুরু করে রেলগাড়ির ভাঙা বগি, চাই কি, জাহাজের খোলের টুকরোও আছে। নিলামে কিনে আনেন রাশেদ পাশা। বেশির ভাগই বাতিল জিনিস, তবে মাঝে মাঝে ভাল জিনিসও বেরিয়ে পড়ে। ওগুলো বেশ ভাল দামেই বিক্রি হয়। আর বাতিল জিনিসপত্রের অনেকগুলোই সারিয়ে নেয়া যায়। ওগুলো থেকেও মোটামুটি টাকা আসে। সব মিলিয়ে ভাল লাভ। তবে খাটুনি অনেক।

কিশোরদের জন্যে পরম লোভনীয় জায়গাটা। খুঁজলেই বেরিয়ে পড়ে প্রচুর খেলার জিনিস।

ইয়ার্ডের আরও কাছে চলে এসেছে রবিন। চোখে পড়ছে রঙচঙে টিনের বেড়ার গায়ে আঁকা বিচিত্র সব ছবি। স্থানীয় শিল্পীদের আঁকা।

বেড়ার গায়ে সামনের দিকে আঁকা রয়েছে গাছপালা, ফুল, হ্রদ। হ্রদের পানিতে সাঁতার কাটছে রাজহাঁস। পাশে পাহাড়ের ওপারে সাগর। সাগরে পালতোলা জাহাজ, নৌকা। কেমন একটা হাসি হাসি ভাব ছবিগুলোতে, ভারিক্কি কিছু নয়।

লোহার বিরাট সদর দরজা। পুড়ে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল কোন প্যালেস। ওখান থেকেই কিনে আনা হয়েছে পাল্লাজোড়া। রঙ করতেই আবার প্রায় নতুন হয়ে গেছে। ইয়ার্ডের শোভা বাড়াচ্ছে এখন।

দরজার কাছে গেল না রবিন। পাশ কাটিয়ে চলে এল। বেড়ার ধার ধরে ধরে

এগিয়ে গেল শ'খানেক গজ। এখানে বেড়ার গায়ে আঁকা নীল সাগর। দুই মাস্তুলের পালতোলা একটা জাহাজ ঝড়ের কবলে পড়েছে। মাথা উঁচু করে দেখছে একটা বড় মাছ।

সাইকেল থেকে নামল রবিন। হ্যান্ডেল ধরে ঠেলে নিয়ে এল বেড়ার কাছে। হাত বাড়িয়ে মাছের চোখ টিপে ধরল।

নিঃশব্দে ডালার মত উঠে গেল বেড়ার গায়ে লেগে থাকা দুটো সবুজ বোর্ড। কয়েকটা গোপন প্রবেশ পথের একটাঃ সবুজ ফটক এক।

সাইকেল নিয়ে ইয়ার্ডে ঢুকে পড়ল রবিন। আবার নামিয়ে দিল বোর্ডদুটো। কানে আসছে ঘটাং-ঘট ঘটাং-ঘট আওয়াজ। কোণের আউটডোর ওয়ার্কশপের দিকে চেয়ে মুচকে হাসল রবিন। ভাঙা মেশিনটা তো মেরামত হয়েছেই, কাজও শুরু হয়ে গেছে!

মাথার ওপরে টিনের চাল। ছয় ফুট চওড়া। টিনের এক প্রান্ত আটকে দেয়া হয়েছে বেড়ার মাথায়, আরেক প্রান্ত খুঁটির ওপর। ভেতরের দিকে বেড়ার ঘরের প্রায় পুরোটার মাথায়ই টানা রয়েছে এই চাল। ভাল আর দামি জিনিসগুলো এই চালার নিচে রাখেন রাশেদ পাশা। একপাশে খানিকটা জায়গার মালপত্র সরিয়ে তার ওয়ার্কশপ বসিয়েছে কিশোর।

সাইকেল স্ট্যান্ডে তুলে রাখতে রাখতে একবার পেছনে ফিরে চাইল রবিন। দৃষ্টি বাধা পেল পুরানো জিনিসপত্রের স্তূপে। ইয়ার্ডের মূল অফিস আর কিশোরের ওয়ার্কশপের মাঝে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে ওই স্তূপ। অফিসের রঙিন টালির চূড়াটা শুধু চোখে পড়ে এখান থেকে। মেরিচাচীর কাচে ঘেরা চেম্বারটা দেখা যায় না।

পুরানো জিনিস কেনার কাজে প্রায় সারাক্ষণই বাইরে বাইরে থাকেন রাশেদচাচা, ইয়ার্ড আর অফিসের ভার থাকে তখন মেরিচাচীর ওপর।

ওয়ার্কশপে ঢুকে পড়ল রবিন। ছোট প্রিন্টিং মেশিনটার কাছে দাঁড়িয়ে আছে লম্বা, বলিষ্ঠ এক কিশোর। কুচকুচে কালো গায়ের রঙ। মাথায় কোঁকড়া কালো চুল। আমেরিকান মুসলমান, মুসা আমান।

মহা ব্যস্ত মুসা। ঘামছে দরদর করে। সাদা একগাদা কার্ড পড়ে আছে পাশের একটা ছোট টুলে। একটা করে কার্ড তুলে নিয়ে মেশিনে চাপাচ্ছে, ছাপা হয়ে গেলেই আবার বের করে নিচ্ছে দ্রুত হাতে।

পাশে তাকাল রবিন। পুরানো একটা সুইভেল চেয়ারে বসে আছে কিশোর পাশা। হালকা-পাতলা শরীরের তুলনায় মাথাটা বড়। ঝাঁকড়া চুল। চওড়া কপালের তলায় অপূর্ব সুন্দর দুটো চোখে তীক্ষ্ণ বুদ্ধির ঝিলিক। বুড়ো আঙুল আর তর্জনীর সাহায্যে চিমটি কাটছে নিচের ঠোঁটে। ভাবনার ঝড় বইছে মাথায়, বুঝতে পারল রবিন।

'কি ছাপাচ্ছ?' মেশিনের কাছে এগিয়ে গেল রবিন।

'এই যে, এসে গেছে,' ফিরে চেয়েই বলে উঠল মুসা।

ভাবনার জগৎ থেকে ফিরে এল কিশোর। রবিনের দিকে চেয়ে বলল, 'মেসেজ পেয়েছ?'

'পেয়েই তো এলাম,' জবাব দিল রবিন।

'গুড,' ভারিক্কি চালে বলল কিশোর। 'মুসা, একটা কার্ড দেখাও ওকে।'

মেশিন বন্ধ করে দিল মুসা। একটা কার্ড তুলে নিয়ে বাড়িয়ে ধরল রবিনের দিকে। 'নাও।'

বড় আকারের একটা ভিজিটিং কার্ড। ইংরেজিতে লেখাঃ

'তিন গোয়েন্দা'

???

প্রধান ঃ কিশোর পাশা

সহকারী ঃ মুসা আমান

নথি গবেষক ঃ রবিন মিলফোর্ড

'বাহ্, সুন্দর হয়েছে তো।' প্রশংসা করল রবিন। 'এগিয়ে যাওয়াই ঠিক করলে তাহলে?'

'হ্যাঁ, ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি খোলার এই-ই সুযোগ,' বলল কিশোর। 'স্কুল ছুটি। তিরিশ দিনের জন্যে একটা গাড়ি হয়ে গেল। খুব কাজে লাগবে,' থামল একটু সে। সরাসরি রবিনের দিকে তাকাল। 'আমরা এখন তিন গোয়েন্দা। এজেন্সির চার্জে থাকছি আমি। তোমার কোন আপত্তি আছে?'

'না,' মাথা নাড়ল রবিন। 'ডিটেকশনের কাজ আমার চেয়ে ভাল বোঝ তুমি।'

'গুড। সহকারী হতে মুসারও আপত্তি নেই,' বলল কিশোর। 'তোমার এখন সময় খারাপ। পা ভাঙা। দৌড়ঝাঁপের কাজগুলো খুব একটা করতে পারবে না। বসে বসেই কিছু কর। আপাতত লেখাপড়া আর রেকর্ড রাখার দায়িত্ব রইল তোমার ওপর।'

'আমি রাজি,' বলল রবিন। 'এবং খুশি হয়েই। লাইব্রেরিতে কাজের ফাঁকে ফাঁকেই পড়াশোনাটা সেরে ফেলতে পারব। রেকর্ড রাখাটাও এমন কিছু কঠিন না।'

'গুড,' মাথা ঝোঁকাল কিশোর। 'ভেবে বস না, খুব হালকা কাজ পেয়ে গেছ। তদন্তের নিয়মকানুন অনেক বদলে গেছে আজকাল। এ-কাজে এখন প্রচুর পড়াশোনা আর গবেষণা দরকার।...কি হল, কার্ডের দিকে ওভাবে চেয়ে আছ কেন?'

'তিনটে প্রশ্নবোধক চিহ্ন! কেন?'

সূক্ষ্ম একটা হাসির আভাস খেলে গেল কিশোরের মুখে। চট করে একবার চাইল মুসার দিকে।

'ঠিকই বলেছ, কিশোর,' মুসার চোখে বন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা। 'ঠিক অনুমান করেছ তুমি!'

'কি?' জানতে চাইল রবিন।

'তুমিই বল,' কিশোরকে বলল মুসা। 'গুছিয়ে বলতে পারব না আমি।'

'চিহ্নগুলো কার্ডে বসানোর অনেক কারণ আছে,' ব্যাখ্যা করতে লাগল কিশোর। 'একঃ রহস্যের ধ্রুবচিহ্ন ওই প্রশ্নবোধক। আমরা কার্ডে দিয়েছি, কারণ, যে-কোন রহস্য সমাধানে আগ্রহী আমরা। ছিঁচকে চুরি থেকে শুরু করে ডাকাতি, রাহাজানি, খুন, এমনকি ভৌতিক রহস্যের তদন্তেও পিছপা নই। দুইঃ চিহ্নগুলো আমাদের ট্রেডমার্ক। দলে তিনজন, তাই তিনটে চিহ্ন,' থামল সে।

অপেক্ষা করে রইল রবিন।

'তিন,' আবার শুরু করল কিশোর। 'লোকের মনে কৌতূহল জাগাবে ওই চিহ্ন। কেন বসানো হয়েছে, জিজ্ঞেস করবেই। কথা বলার সুযোগ পাব তখন। এতে আমাদের কথা মনে থাকবে তাদের। নাম ছড়াবে অনেক বেশি,' রবিনের দিকে চাইল সে। 'আরও কারণ আছে, পরে ধীরে ধীরে জানতে পারবে সেগুলো।'

আর কি কারণ জানার কৌতূহল হল খুব, কিন্তু বলার জন্যে চাপাচাপি করল না রবিন। বন্ধুর স্বভাব জানে। নিজে থেকে না বললে হাজার চাপাচাপি করেও মুখ খোলানো যাবে না কিশোরের।

'মেশিন ঠিক, কার্ড ছাপানো শেষ, গাড়িও পেয়ে গেছি,' বলল রবিন। 'এবার কোন একটা কাজ পেয়ে গেলেই নেমে পড়তে পারতাম।'

'কাজ একটা পেয়ে গেছি আমরা,' মুসা জানাল।

'পাইনি এখনও,' শুধরে দিল কিশোর। 'পাবার আশা আছে।' সোজা হয়ে বসল সে। 'তবে সামান্য একটা অসুবিধে আছে।'

'কেসটা কি? অসুবিধেটাই বা কি?' কৌতূহল ঝরল রবিনের গলায়।

'একটা ভুতুড়ে বাড়ি খুঁজছেন মিস্টার ডেভিস ক্রিস্টোফার, সত্যি সত্যি ভূত থাকতে হবে। তাঁর একটা ছবির শূটিং করবেন সেখানে,' জানাল মুসা। 'স্টুডিও থেকে শুনে এসেছে বাবা।'

হলিউডের বেশ বড়োসড়ো একটা স্টুডিওতে বিশেষ দায়িত্বপূর্ণ পদে বহাল আছেন মুসার বাবা মিস্টার রাফাত আমান।

'ভুতুড়ে বাড়ি!' ভুরু কুঁচকে গেছে রবিনের। 'তা-ও আবার সত্যি সত্যি ভূত থাকতে হবে! তা কি করে সম্ভব?'

'ভূত আছে কি নেই, সেটা পরের কথা। তেমন একটা বাড়ির খোঁজ পেলেই তদন্ত শুরু করে দেব আমরা,' জবাব দিল কিশোর। 'ভূত থাকলে তো কথাই নেই, না থাকলেও ক্ষতি নেই। আমরা খোঁজখবর করতে শুরু করলেই জানাজানি হবে। নাম ছড়াবে তিন গোয়েন্দার।'

'অসুবিধে কি ভূত নিয়েই?'

'না?'

'তবে? মিস্টার ক্রিস্টোফার আমাদেরকে কাজ নিতে রাজি হচ্ছেন না।'

'হতেই হবে তাঁকে। আমাদের সার্ভিস নিতে বাধ্য করব,' কেমন রহস্যময় শোনাল কিশোরের গলা। 'তিন গোয়েন্দার যাত্রা শুরু হবে মিস্টার ডেভিস ক্রিস্টোফারের কাজ নিয়েই।'

'শিওর, শিওর!' ব্যঙ্গ প্রকাশ পেল রবিনের গলায়। 'মার্চ করে সোজা গিয়ে ঢুকে পড়ব পৃথিবী বিখ্যাত এক চিত্র পরিচালকের অফিসে! এবং আমরা গিয়ে হাজির হলেই কাজ দিয়ে দেবেন! এতই সহজ!'

'খুব কঠিনও মনে হচ্ছে না আমার কাছে,' বলল কিশোর। 'ইতিমধ্যেই মিস্টার ক্রিস্টোফারকে ফোন করেছি আমি। অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্যে।'

'ইয়াল্লা!' রবিনের মতই ভুরু কুঁচকে গেছে মুসার। 'তিনি দেখা করবেন আমাদের সঙ্গে?'

'না,' সহজ গলায় বলল কিশোর। 'লাইনই দেয়নি তার সেক্রেটারি।'

'তা তো দেবেই না,' বলল মুসা।

'শুধু তাই না, শাসিয়েছে, তাঁর অফিসের কাছাকাছি গেলেই আমাদেরকে হাজতে পাঠানর ব্যবস্থা করবে,' যোগ করল কিশোর। 'মেয়েটা কে জান? কেরি ওয়াইল্ডার।'

'মুরুব্বী কেরি!' একসঙ্গে বলে উঠল মুসা আর রবিন।

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। ওদের চেয়ে কয়েক গ্রেড ওপরের ছাত্রী কেরি ওয়াইল্ডার। পড়ালেখায় ভাল। সুনাম আছে ভাল মেয়ে বলে। স্কুলে নিচের গ্রেডের ছাত্র-ছাত্রীদের ক্লাস নেয় মাঝে মাঝে। মুরুব্বীয়ানা ফলানর লোভটা সামলাতে পারে না। ফলে নাম হয়ে গেছে মুরুব্বী কেরি।

'এবারের ছুটিতে তাহলে সেক্রেটারির কাজ নিয়েছে মুরুব্বী!' চিন্তিত দেখাচ্ছে রবিনকে। 'মিস্টার ক্রিস্টোফারের সঙ্গে দেখা করার আশা ছেড়ে দাও। মুরুব্বীর অফিস পেরোনর চেয়ে প্রশান্ত মহাসাগর পাড়ি দেয়া অনেক সহজ।'

'মূল অসুবিধে এটাই,' বলল কিশোর। 'তবে যে কাজে নামতে যাচ্ছি, বাধা আর বিপদ আসবেই পদে পদে। ওসবের মোকাবিলা করতে না পারলে নামাই উচিত না। আগামীকাল সকালে রোলস রয়েসে চেপে হলিউডে চলে যাব। দেখা করতেই হবে মিস্টার ক্রিস্টোফারের সঙ্গে।'

'যদি পুলিশে খবর দেয় মুরুব্বী?' বলল রবিন। 'আমার ব্যাপারে অবশ্য ভাবছি না। কাল তোমাদের সঙ্গে যেতে পারব না আমি। লাইব্রেরিতে কাজ আছে।'

'তাহলে আমি আর মুসা যাব। কাল সকাল দশটায়। তার আগেই গাড়ি

পাঠাতে ফোন করব কোম্পানিকে। হ্যাঁ, তুমি একটা কাজ কর, রবিন,' বলে একটা কার্ড তুলে নিল কিশোর। উল্টোপিঠে একটা নাম লিখে বাড়িয়ে ধরল। 'এটা রাখ। এই নামের একটা দুর্গ আছে। পুরানো ম্যাগাজিন কিংবা পত্র-পত্রিকায় নিশ্চয় উল্লেখ থাকবে। এটার ব্যাপারে যত বেশি পার তথ্য জোগাড় করবে।'

'টেরর ক্যাসল!' পড়ে ফিসফিসিয়ে বলল রবিন। বড় বড় হয়ে গেছে চোখ।

'নাম শুনেই ঘাবড়ে গেলে! এত ভয় পেলে গোয়েন্দাগিরি করবে কি করে?'

'না না, ঘাবড়াইনি...'

'ঠিক আছে,' বাধা দিয়ে বলল কিশোর। 'কিছু কার্ড সঙ্গে রাখ। তিনজনকেই রাখতে হবে এখন থেকে। এগুলোই আমাদের পরিচয়পত্র। আগামীকাল থেকে পুরোপুরি কাজে নামব আমরা। পালন করব যার যার দায়িত্ব।'

দুই

পরদিন সকালে, গাড়ি পৌঁছার অনেক আগেই তৈরি হয়ে গেল মুসা আর কিশোর। লোহার গেটের বাইরে এসে রোলস রয়েসের অপেক্ষায় রইল ওরা। দু'জনেরই পরনে সানডে সুট, শার্ট আর নেকটাই। পরিপাটি করে আঁচড়ানো চুল। পরিচ্ছন্ন চেহারা। হাতের নখ অবধি পরিষ্কার করেছে ব্রাশ ঘষে।

অবশেষে হাজির হল বিশাল রোলস রয়েস। গাড়িটার উজ্জ্বলতার কাছে নিজেদেরকে একেবারে ম্লান মনে হল দু'জনের। পুরানো ধাঁচের ক্লাসিক্যাল চেহারা। প্রকাণ্ড দুটো হেডলাইট। চৌকো: বাক্সের মত দেখতে মূল শরীরটা কুচকুচে কালো। চকচকে পালিশ, মুখ দেখা যায়।

'খাইছে!' কিশোরের মুখে শোনা বাঙালী বুলি ঝাড়ল মুসা। এগিয়ে আসা গাড়িটার দিকে অবাক চোখে চেয়ে আছে। 'একশো দশ বছর বয়েসী কোটিপতির উপযুক্ত!'

'পৃথিবীর সবচেয়ে দামি গাড়ির একটা,' বলল কিশোর। 'কোটিপতি এক আরব শেখের অর্ডারে তৈরি হয়েছিল। এই গাড়িও নাকি পছন্দ হয়নি শেখের। ফলে ডেলিভারি নেয়নি। কম দামে পেয়ে কিনে নিয়েছে রেন্ট-আ-রাইড কোম্পানি। নিজেদের বিজ্ঞাপনের কাজে ব্যবহার করছে।'

কাছে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল রোলস রয়েস। ঝটকা দিয়ে খুলে গেল দরজা। ড্রাইভিং সিট থেকে দ্রুত নেমে এল শোফার। ছয় ফুট লম্বা, আঁট-সাট দেহের গড়ন। লম্বাটে হাসিখুশি চেহারা। একটানে মাথার টুপি খুলে হাতে নিয়ে নিল।

'মাস্টার পাশা?' সপ্রশ্ন চোখে কিশোরের দিকে চেয়ে বলল লোকটা। 'আমি হ্যানসন, শোফার।'

'পরিচিত হয়ে খুশি হলাম, মিস্টার হ্যানসন,' বলল কিশোর। 'আমাকে কিশোর

বলে ডাকবেন, আর সবাই যেমন ডাকে।'

'প্লীজ,স্যার,' দুঃখ পেয়েছে যেন শোফার, 'আমাকে শুধু হ্যানসন বলবেন। আপনাকে নাম ধরে ডাকা উচিত হবে না। কারণ এখন আপনার অধীনে কাজ করছি আমি। বেয়াদবী করতে চাই না।'

'ঠিক আছে, শুধু হ্যানসন,' বলল কিশোর।

'থ্যাঙ্ক ইউ, স্যার। আগামী তিরিশ দিনের জন্যে এই গাড়ি আপনার।'

'চব্বিশ ঘন্টার জন্যে নিশ্চয়? শর্ত তাই ছিল।'

'নিশ্চয়, স্যার।' পেছনের দরজা খুলে ধরল হ্যানসন। 'প্লীজ।'

'থ্যাঙ্ক ইউ,' বলে গাড়িতে উঠল কিশোর। মুসাও ঢুকল। হ্যানসনের দিকে চেয়ে বলল কিশোর, 'বেশি ফর্মালিটির দরকার নেই। দরজা আমরাই খুলতে পারব।'

'কিছু মনে করবেন না, স্যার,' বলল ইংরেজ শোফার, 'চাকরির পুরো দায়িত্ব পালন করতে দিন আমাকে। ঢিল দিয়ে নিজের স্বভাব নষ্ট করতে চাই না।'

পেছনের দরজা বন্ধ করে দিল হ্যানসন। সামনের দরজা খুলে ড্রাইভিং সিটে উঠে বসল।

'কিন্তু মাঝেমধ্যে তাড়াহুড়ো করে বেরোতে কিংবা ঢুকতে হতে পারে আমাদের,' বলল কিশোর। 'তখন আপনার জন্যে অপেক্ষা করতে পারব না। তবে এক কাজ করা যায়। শুরুতে একবার দায়িত্ব পালন করবেন আপনি, আরেকবার একেবারে বাড়ি ফিরে। মাঝে যতবার খোলা বা বন্ধ করার দরকার পড়বে, আমরা করব। ঠিক আছে?'

'ঠিক আছে, স্যার। সুন্দর সমাধান।'

রিয়ার ভিউ মিররে চোখ পড়ল কিশোরের। তার দিকে চেয়ে হাসছে হ্যানসন। তাড়াতাড়ি বলল কিশোর, 'অনেক সম্ভ্রান্ত লোকের কাজ করেছেন নিশ্চয়? বুঝতেই পারছি, ওরা কেউই আমাদের মত ছিল না। অনেক আজব, উদ্ভট জায়গায় যেতে হতে পারে আমাদের, কাজ করতে...,' একটা কার্ড নিয়ে হ্যানসনের দিকে বাড়িয়ে ধরল সে। 'এটা দেখলেই আন্দাজ করতে পারবেন।'

গম্ভীর মুখে কার্ডটা ফিরিয়ে দিতে দিতে বলল হ্যানসন, 'বুঝতে পেরেছি, স্যার। আপনাদের কাজ করতে আমার খুবই ভাল লাগবে। কিশোর অ্যাডভেঞ্চারের কাজ করে একঘেয়েমিও কাটাতে পারব। এতদিন শুধু বুড়োদের চাকরি করেছি, সবাই বাড়ি থেকে অফিস কিংবা অফিস থেকে বাড়ি। মাঝেমধ্যে পার্টিতে যেত, ব্যস। তো এখন কোথায় যাব, স্যার?'

হ্যানসনকে খুব পছন্দ হয়ে গেছে দুই গোয়েন্দার। লোকটা সত্যিই ভাল। তাদেরকে মোটেই অবহেলা করছে না।

'হলিউডে, প্যাসিফিক স্টুডিওতে,' বলল কিশোর। 'মিস্টার ডেভিস

ক্রিস্টোফারের সঙ্গে দেখা করব। গতকাল ফোনে···মানে, টেলিফোন করেছিলাম তাঁকে।'

'যাচ্ছি, স্যার।'

মৃদু গুঞ্জন করে উঠল রোলস রয়েসের দামি ইঞ্জিন। এতই মৃদু যে শোনাই যায় না প্রায়। পাহাড়ী পথ ধরে মসৃণ গতিতে হলিউডের দিকে ছুটল রাজকীয় গাড়ি।

সামনে পথের ওপর দৃষ্টি রেখে বলল হ্যানসন, 'গাড়িতে টেলিফোন আছে। একটা রিফ্রেশমেন্ট কম্পার্টমেন্টও আছে। চাইলে ব্যবহার করতে পারেন।'

'থ্যাঙ্ক ইউ,' গম্ভীর গলায় বলল কিশোর। এত দামি একটা গাড়িতে চড়ে নিজেকে হোমরা-চোমরা গোছের কেউ একজন ভাবতে শুরু করেছে ইতিমধ্যেই। সামনের সিটের পেছনে বসানো একটা খোপের ছোট্ট দরজা খুলে ফেলল বোতাম টিপে। বের করে আনল টেলিফোন রিসিভারটা। এত সুন্দর রিসিভার জীবনে দেখেনি সে। সোনালি রঙ। চকচকে পালিশ। কোন ডায়াল নেই। একটা বোতাম আছে শুধু।

'মোবাইল টেলিফোন,' জানাল হ্যানসন। 'বোতামে শুধু একবার চাপ দিলেই যোগাযোগ হয়ে যাবে অপারেটরের সঙ্গে। তাকে নাম্বার জানালে লাইন দিয়ে দেবে। খুব সহজ।'

রিসিভারটা আবার আগের জায়গায় রেখে দিল কিশোর। আরাম করে হেলান দিয়ে বসল নরম চামড়া মোড়ানো পুরু গদিতে।

দেখতে দেখতে হলিউডে এসে ঢুকল গাড়ি। ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোর ধার দিয়ে চলেছে এখন। গন্তব্যস্থান যতই কাছিয়ে আসছে, অস্থির হয়ে উঠছে মুসা। খালি উসখুস করছে, 'কিশোর,' শেষে বলেই ফেলল সে। 'বুঝতে পারছি না স্টুডিওর গেট পেরোবে কি করে! আমাদেরকে কিছুতেই ঢুকতে দেবে না দারোয়ান। ওই গেটই পেরোতে পারব না আমরা।'

'উপায় একটা ভেবে রেখেছি,' বলল কিশোর। 'কাজে লাগলেই হয়। এই যে, এসে গেছি।'

উঁচু বিশাল এক দেয়ালের ধার দিয়ে এগিয়ে চলেছে গাড়ি। বড় বড় দুটো ব্লক পেরিয়ে এল। সামনের দেয়ালের গায়ে বিরাট লোহার দরজা। গেটের কপালে বড় বড় করে লেখাঃ প্যাসিফিক স্টুডিও।

দরজার সামনে এসে থামল গাড়ি। বন্ধ পাল্লা। হর্নের আওয়াজ শুনে পাল্লার একদিকের ছোট একটা গর্তের সামনে থেকে ঢাকনা সরে গেল। উঁকি দিল একটা গোমড়া মুখ। 'কোথায় যাবেন?'

জানালা দিয়ে মুখ বের করে দিল হ্যানসন। 'মিস্টার ডেভিস ক্রিস্টোফার।'

'পাস আছে?'

'পাসের দরকার নেই। টেলিফোন করেই এসেছি।'

মিছে কথা বলেনি হ্যানসন। ঠিকই টেলিফোন করেছিল কিশোর। মিস্টার ক্রিস্টোফারকে লাইন দেয়া হয়নি, সেটা তার দোষ না।

'ও-ও!' অনিশ্চিতভাবে মাথা চুলকাচ্ছে দারোয়ান।

ঠিক এই সময় পেছনের একপাশে সাইড উইন্ডো খুলে গেল। বেরিয়ে এল কিশোরের মুখ। 'এই যে ভাই, কি হয়েছে? দেরি কেন?'

দারোয়ানের দিকে চোখ মুসার। কিশোরের কথা কানে যেতেই চমকে উঠল। কেমন ঘড়ঘড়ে গলা, কথায় খাঁটি ব্রিটিশ টান। ফিরে চাইল। 'ইয়াল্লা?' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল সে।

এ কোন কিশোরকে দেখছে! ঝুলে পড়েছে নিচের ঠোঁট। মাড়ি বেরিয়ে পড়েছে। মাথা সামান্য পেছনে হেলানো। নাকের ওপর দিয়ে চেয়ে আছে। বিচ্ছিরি! মিস্টার ডেভিস ক্রিস্টোফারের কিশোর সংস্করণ, কোন খুঁত নেই। এক সময় টিভিতে অভিনয় করে প্রচুর নাম কামিয়েছে কিশোর। এ-অঞ্চলে তখন ছিল না মুসা, কিশোরের সেসব অভিনয় দেখেনি। তবে আজ বুঝতে পারল, লোকে কেন কিশোর পাশার নাম রেখেছে নকল পাশা।

হাঁ করে কিশোরের দিকে চেয়ে আছে দারোয়ান। রা নেই মুখে।

'ঠিক আছে,' নাকের ওপর দিয়ে দারোয়ানের মাথা থেকে পা পর্যন্ত নজর বোলাল একবার কিশোর, মিস্টার ক্রিস্টোফারের অনুকরণে।

'সন্দেহ থাকলে ফোন করছি আমি চাচাকে।'

সোনালি রিসিভারটা বের করে আনল কিশোর। কানে ঠেকাল। বোতাম টিপে দিয়ে নিচু গলায় নাম্বার চাইল। আসলে পাশা স্যালভিজ ইয়ার্ডের নাম্বার। সত্যিই তার চাচার লাইন চেয়েছে কিশোর।

দামি গাড়িটার দিকে আরেকবার চাইল দারোয়ান। সোনালি রিসিভারটা দেখল। কিশোরের টেলিফোন কানে ঠেকিয়ে কথা বলার ভঙ্গিতে দেখল। তারপর সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল। 'ঠিক আছে, আপনার ফোন করার দরকার নেই। আমিই জানিয়ে দিচ্ছি, আপনারা তাঁর অফিসে যাচ্ছেন।'

'থ্যাঙ্ক ইউ।'

খুলে গেল দরজা। 'হ্যানসন, আগে বাড়ো।' গম্ভীর গলায় দারোয়ানকে শুনিয়ে শুনিয়ে আদেশ দিল কিশোর।

সূক্ষ্ম একটা হাসির রেখা দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল হ্যানসনের ঠোঁটে। সাঁ করে গাড়ি ঢুকিয়ে নিল সে ভেতরে।

এগিয়ে চলল গাড়ি। অনেকখানি এগিয়ে মোড় নিল একদিকে। সরু পথ। দু'ধারে সবুজ লনের পথঘেঁষা প্রান্তে পাম গাছের সারি। লনের ওপারে ছবির মত সুন্দর ছিমছাম ছোট আকারের ডজনখানেক বাংলো। নাক বরাবর সোজা পথের শেষ মাথায় বিশাল অনেকগুলো শেড। স্টুডিও। একটা শেডের সামনে দাঁড়িয়ে

আছে কয়েকজন অভিনেতা-অভিনেত্রী।

গেটের বাধা ডিঙিয়ে এসেছে, স্টুডিওতে ঢুকে পড়েছে ওরা। এখনও মাথায় ঢুকছে না মুসার, মিস্টার ক্রিস্টোফারের সঙ্গে কি করে দেখা করবে কিশোর! বেশিক্ষণ ভাবার সময় পেল না সে। একটা বড় বাংলোর সামনে এনে গাড়ি রেখেছে হ্যানসন। বোঝা গেল, আগেও এসেছে এখানে। পথঘাট সব চেনা। বাংলোর দেয়ালে এক জায়গায় বড় বড় করে লেখাঃ ডেভিস ক্রিস্টোফার। আলাদা আলাদা বাংলোতে বিভিন্ন পরিচালকের অফিস। কে কোথায় বসেন, বোঝার জন্যেই এই নাম লেখার ব্যবস্থা।

'আপনি বসুন গাড়িতে,' পেছনের দরজা ধরে দাঁড়ানো হ্যানসনকে বলল কিশোর। বেরিয়ে এল। 'কতক্ষণে ফিরব বলা যায় না।'

'ঠিক আছে, স্যার।'

সিঁড়ি ভেঙে বারান্দায় উঠল কিশোর, পেছনে মুসা। সামনের স্ক্রীনডোর ঠেলে ভেতরে পা রাখল। এয়ার কণ্ডিশনড রিসিপশন রুম। একটা ডেস্কের ওপাশে বসে আছে সোনালিচুলো একটা মেয়ে। সবে নামিয়ে রাখছে রিসিভার। অনেকদিন দেখা নেই। হঠাৎ বেড়ে ওঠা কেরিওয়াইল্ডারকে প্রথমে চিনতেই পারল না মুসা, গলার আওয়াজ শুনে নিশ্চিত হতে হল।

'তাহলে,' কোমরে দু'হাত রেখে উঠে দাঁড়িয়েছে মুরুব্বী, 'ঢুকেই পড়েছ? মিস্টার ক্রিস্টোফারের ভাতিজা!' বেশ, কত তাড়াতাড়ি স্টুডিও পুলিশকে আনানো যায়, দেখছি।' টেলিফোনের দিকে হাত বাড়াল কেরি।

একেবারে চুপসে গেল মুসা। বিড়বিড় করে বলল, 'ইয়াল্লা!'

'থাম!' বলে উঠল কিশোর।

'কেন?' সামনের দিকে চিবুক বাড়িয়ে দিয়ে আলতো মাথা ঝাঁকাল কেরি। 'গার্ডকে ফাঁকি দাওনি তুমি? বলনি মিস্টার ক্রিস্টোফারের ভাতিজা...'

'না, বলেনি,' বন্ধুর পক্ষে সাফাই গাইল মুসা। 'গার্ডই ভুল করেছে।'

'তোমাকে কথা বলতে কে বলেছে?' ধমকে উঠল কেরি। 'প্রায়ই গোলমাল করে কিশোর পাশা। স্কুলে অন্যের ব্যাপারে নাক গলানর অনেক উদাহরণ আছে। এবার কিছুটা শিক্ষা দিয়ে ছাড়ব আমি।'

ঘুরে টেলিফোনের ওপর ঝুঁকল কেরি। হাত বাড়াল রিসিভারের দিকে।

'তাড়াহুড়ো করে কিছু করা উচিত নয়, মিস ওয়াইল্ডার,' বলল কিশোর।

আবার চমকে উঠল মুসা। আবার পুরোদস্তুর ইংরেজ, কথায় সেই অদ্ভুত টান—মিস্টার ডেভিস ক্রিস্টোফার যেভাবে কথা বলেন। চকিতে আবার 'কিশোর ক্রিস্টোফার' হয়ে গেছে কিশোর।

'আমি শিওর, এটা দেখতে চাইবেন মিস্টার ক্রিস্টোফার,' বলল কিশোর।

রিসিভার হাতে তুলে নিয়েছে কেরি। কিশোরের কথায় ফিরে চাইল। সঙ্গে

সঙ্গে খসে পড়ে গেল রিসিভার। চোখ বড় বড় হয়ে গেছে, ছিটকে বেরিয়ে আসবে যেন কোটর ছেড়ে। কেব্‌ল্‌ থেকে ঝুলছে রিসিভারটা। টেবিলের পায়ার সঙ্গে বাড়ি খাচ্ছে খটাখট, কানেই ঢুকছে না যেন তার। 'তুমি…তুমি…!' ফিসফিস করছে সে, '…তুমি…' হঠাৎই ভাষা খুঁজে পেল যেন কেরি। 'হ্যাঁ, কিশোর পাশা, সত্যিই বলেছ! এটা দেখতে চাইবেন মিস্টার ক্রিস্টোফার!'

'কি, মিস ওয়াইল্ডার?'

দ্রুত তিন জোড়া চোখ ঘুরে গেল দরজার দিকে। দরজায় এসে দাঁড়িয়েছেন মিস্টার ডেভিস ক্রিস্টোফার স্বয়ং। শরীরের তুলনায় মাথা বড়। ঝাঁকড়া চুল। এত বেশি ঝুলে পড়েছে নিচের ঠোঁট, মাড়ি দেখা যায়। ভীষণ কুৎসিৎ চেহারা।

'কি হয়েছে? কোন গোলমাল?' আবার জানতে চাইলেন মিস্টার ক্রিস্টোফার। 'সেই কখন থেকে রিঙ করছি আমি।'

'গোলমাল কিনা আপনিই ঠিক করুন, মিস্টার ক্রিস্টোফার,' ফস করে বলে বসল কেরি। 'এই ছেলেটা কিছু দেখাতে চায় আপনাকে। আপনি মুগ্ধ হবেন।'

'সরি,' বললেন মিস্টার ক্রিস্টোফার। 'কারও সঙ্গেই দেখা করতে পারব না আজ। হাতে কাজ অনেক। ওকে যেতে বল।'

'আমি শিওর, মিস্টার ক্রিস্টোফার, আপনি দেখতে চাইবেন!' কেমন এক গলায় কথা বলে উঠল কেরি।

স্থির চোখে কেরির দিকে তাকালেন মিস্টার ক্রিস্টোফার। তারপর ফিরলেন দুই কিশোরের দিকে। কাঁধ ঝাঁকালেন। 'ঠিক আছে। এস।'

বিশাল এক টেবিলের ওপাশে সুইভেল চেয়ারে গিয়ে বসলেন মিস্টার ক্রিস্টোফার। ইচ্ছে করলে টেবিল-টেনিস খেলা যাবে টেবিলটাতে, এত বড়। তাঁর দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল দুই গোয়েন্দা। পেছনে দরজাটা ওপাশ থেকে বন্ধ করে দিল কেরি।

'তারপর, ছেলেরা,' বললেন মিস্টার ক্রিস্টোফার, পাঁচ মিনিট সময় দিচ্ছি তোমাদের, 'কি দেখাতে চাও?'

'এটা স্যার,' অদ্ভুত ভঙ্গিতে পকেট থেকে একটা কার্ড বের করে টেবিলের ওপর দিয়ে ঠেলে দিল কিশোর। ভঙ্গিটা লক্ষ্য করলেন মিস্টার ক্রিস্টোফার। একেবারে তাঁর নিজের ভঙ্গি। হাত বাড়িয়ে তুলে নিলেন কার্ডটা।

'হুমম! তোমরা তাহলে গোয়েন্দা। প্রশ্নবোধক চিহ্নগুলো কেন? নিজেদের ক্ষমতার ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ?'

'না, স্যার,' জবাব দিল কিশোর। 'ওগুলো আমাদের ট্রেডমার্ক। যে-কোন ধরনের রহস্য ভেদ করতে রাজি আমরা। তাছাড়া ওই চিহ্ন কার্ডে বসানোর কারণ জিজ্ঞেস করবেই লোকে, আমাদেরকে মনে রাখবে।'

'আচ্ছা!' ছোট্ট একটা কাশি দিলেন মিস্টার ক্রিস্টোফার। 'নাম প্রচারের

ব্যাপারে খুব আগ্রহী মনে হচ্ছে?'

'নিশ্চয়, স্যার। লোকে আমাদের নামই যদি না জানল, ব্যবসা টেকাব কি করে?'

'ভাল যুক্তি,' স্বীকার করলেন মিস্টার ক্রিস্টোফার। 'কিন্তু ব্যবসা তো শুরুই করনি এখনও।'

'সেজন্যেই তো এসেছি, স্যার। আপনাকে একটা ভূতুড়ে বাড়ি খুঁজে দিতে চাই আমরা।'

'ভূতুড়ে বাড়ি?' ভুরুজোড়া সামান্য উঠে গেল মিস্টার ক্রিস্টোফারের। 'আমি ভূতুড়ে বাড়ি খুঁজছি, ভাবনাটা কেন এল মাথায়?'

'শুনেছি, আপনার পরের ছবির জন্যে একটা ভূতুড়ে বাড়ি খুঁজছেন,' বলল কিশোর। 'আপনার খোঁজায় সাহায্য করতে আগ্রহী তিন গোয়েন্দা।'

তাচ্ছিল্যের হাসি ফুটল মিস্টার ক্রিস্টোফারের মুখে। 'দুটো বাড়ির খোঁজ ইতিমধ্যেই পেয়ে গেছি আমি,' বললেন তিনি। 'একটা ম্যাসাচুসেটসের সালেমে, আরেকটা দক্ষিণ ক্যারোলিনার চার্লসটনে। দুটো জায়গাতেই নাকি ভূতের উপদ্রব আছে। আগামীকাল আমার দুজন লোক যাবে জায়গাগুলো দেখতে। আমি শিওর, দুটোর একটা জায়গা আমার পছন্দ হবেই।'

'কিন্তু আমরা যদি এখানে, এই ক্যালিফোর্নিয়াতেই একটা বাড়ি খুঁজে দিতে পারি, অনেক সহজ হয়ে যাবে আপনার কাজ।'

'আমি দুঃখিত, খোকা। তা হয় না আর এখন।'

'টাকা পয়সা কিচ্ছু চাই না আমরা, স্যার,' বলল কিশোর। 'শুধু প্রচার চাই। এজন্যে কাউকে লিখতে হবে আমাদের কথা। যেমন লেখা হয়েছে শার্লক হোমস, এরকুল পোয়ারোর কাহিনী। আমার ধারণা, ওদের কথা লেখা হয়েছে বলেই আজ ওরা এত নামী গোয়েন্দা। না না, স্যার, আপনাকে লিখতেও হবে না। লিখে দেবেন আমাদের এক সহকারীর বাবা, মিস্টার রোজার মিলফোর্ড। খবরের কাগজে চাকরি করেন তিনি।'

'আচ্ছা, এবার তাহলে,' ঘড়ি দেখলেন মিস্টার ক্রিস্টোফার।

'মিস্টার ক্রিস্টোফার, ভেবেছিলাম আমাদের প্রথম কেসটায় একটু সাহায্য করবেন...'

'সম্ভব না, যাবার পথে দয়া করে কেরিকে একবার আসতে বলে যেও।'

'ঠিক আছে, স্যার,' হতাশ মনে হল কিশোরকে।

ঘুরে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে হাঁটতে শুরু করল দুই গোয়েন্দা। দরজার কাছাকাছি পৌঁছে গেছে, পেছন থেকে ডাক শোনা গেল মিস্টার ক্রিস্টোফারের, 'একটু দাঁড়াও।'

'বলুন, স্যার,' ঘুরে দাঁড়াল কিশোর। মুসাও ঘুরল।

চোখ কুঁচকে তাদের দিকে চেয়ে আছেন মিস্টার ক্রিস্টোফার। 'কেন যেন মনে হচ্ছে, যা দেখাতে এসেছ তা দেখাওনি। কি দেখাবে বলে বলেছিল মিস ওয়াইল্ডার? নিশ্চয় তোমাদের ভিজিটিং কার্ড নয়?'

'ঠিকই বলেছেন, স্যার,' স্বীকার করল কিশোর। 'আমি লোকের গলার স্বর, কথা বলার ভঙ্গি, এমনকি অনেকের চেহারাও নকল করতে পারি। মিস ওয়াইল্ডারকে আপনার ছেলেবেলার চেহারা নকল করে দেখিয়েছিলাম।'

'আমার ছেলেবেলার চেহারা!' ভারি হয়ে গেল বিখ্যাত পরিচালকের স্বর। চেহারায় মেঘ জমতে শুরু করছে। 'কি বলতে চাইছ?'

'ঠিক আছে, দেখাচ্ছি, স্যার।'

চোখের পলকে বদলে গেল কিশোরের চেহারা। 'আমার ধারণা, মিস্টার ক্রিস্টোফার,' গলার স্বরও পাল্টে গেছে। 'হয়ত কোন ছবিতে আপনার ছেলেবেলার চেহারা দেখতে চাইবেন। মানে, ছেলেবেলার কোন ঘটনা কাউকে দিয়ে অভিনয় করাতে চাইবেন...'

হেসে ফেললেন মিস্টার ক্রিস্টোফার। পরক্ষণেই গম্ভীর হয়ে গেলেন আবার। 'বিচ্ছিরি! থামাও ওসব!'

আপন চেহারায় ফিরে এল কিশোর। 'পছন্দ হল না, স্যার? আপনার ছেলেবেলার চেহারা নিশ্চয় এমন ছিল?'

'না না, এত বিচ্ছিরি ছিলাম না আমি! কিচ্ছু হয়নি তোমার!'

'তাহলে আরও কিছুদিন প্র্যাকটিস করতে হবে,' আপনমনেই বলল কিশোর। 'টেলিভিশন থেকে খুব চাপাচাপি করছে...'

'টেলিভিশন!' সতর্ক হয়ে উঠেছেন পরিচালক। 'কিসের চাপাচাপি?'

'মাঝেমধ্যে টেলিভিশনে কমিক দেখাই আমি। আগামী হপ্তায় বাচ্চাদের একটা অনুষ্ঠান আছে। ভাবছি, এবারে আপনার চেহারা, কথা বলার ধরন নকল করে...'

'খবরদার!' গর্জে উঠলেন মিস্টার ক্রিস্টোফার। 'আমি নিষেধ করছি!'

'কেন, স্যার?' নিরীহ গলা কিশোরের। 'দোষ কি এতে? বাচ্চারা যদি একটু মজা পায়...'

'না-আ!' কি যেন একটু ভাবলেন পরিচালক। 'ঠিক আছে, তোমাদের প্রস্তাবে আমি রাজি। তবে কথা দিতে হবে, কক্ষণো, কোথাও আমার চেহারা নকল করে দেখাতে পারবে না।'

'থ্যাঙ্ক ইউ, মিস্টার ক্রিস্টোফার,' হাসিমুখে বলল কিশোর। 'তাহলে ভুতুড়ে-বাড়ি খোঁজার অনুমতি দিচ্ছেন আমাদেরকে?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, দিচ্ছি। তেমন বাড়ি পেলেও ওটা ব্যবহার করব, এমন কথা দিতে পারছি না। তবে তোমাদের নাম প্রচারের ব্যবস্থা করব। এখন বেরোও, মেজাজ আরও বিগড়ে যাবার আগেই। হয়ত আবার মত পাল্টে বসতে পারি। ভয়ানক

চালাক ছেলে তুমি, কিশোর পাশা! নিজের কাজটা ঠিক উদ্ধার করে নিয়ে গেলে! ভীষণ চালাক!'

আর কিছু শোনার দরকার মনে করল না কিশোর আর মুসা। প্রায় ছুটে বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

তিন

পড়ন্ত বিকেল। হ্যাণ্ডেল ধরে সাইকেলটা ঠেলে নিয়ে এসে সবুজ ফটক এক-এর সামনে দাঁড়াল রবিন। গাল-মুখ লাল, হাঁপাচ্ছে। হতচ্ছাড়া টিউব ফুটো হবার আর সময় পেল না! বিড়বিড় করছে সে আপনমনেই।

ইয়ার্ডের ভেতরে এসে ঢুকল রবিন। মেরিচাচীর গলা শোনা যাচ্ছে অফিসের ওদিক থেকে। রাশেদ চাচার দুই সহকারী বোরিস আর রোভারকে কাজের নির্দেশ দিচ্ছেন। ওয়ার্কশপ খালি। কিশোর কিংবা মুসা, কেউই নেই।

এটাই আশা করেছিল রবিন। সাইকেলটা রেখে ছোট ছাপার মেশিনটার ওপাশ ঘুরে একটা জায়গায় এসে দাঁড়াল। একটা ওয়ার্ক-বেঞ্চের গায়ে হেলান দিয়ে ফেলে রাখা হয়েছে একটা লোহার পাত।

বিশাল এক গ্যালভানাইজড পাইপের মুখ ঢেকে রাখা হয়েছে পাতটা ফেলে। বসে পড়ে ওটা একটু সরাল রবিন। ফাঁক গলে এসে ঢুকল পাইপের মুখের ভেতরে। পাতটা আবার আগের জায়গায় টেনে বসাল। দ্রুত ক্রল করে এগিয়ে চলল পাইপের ভেতর দিয়ে। এটাও একটা গুপ্ত পথ, নাম রাখা হয়েছে 'দুই সুড়ঙ্গ।'

পাইপের অন্য মাথায় চলে এল রবিন। একটা কাঠের বোর্ড কায়দা করে বসানো আছে ও-মাথায়। ঠেলা দিতেই সরে গেল বোর্ড।

হেডকোয়ার্টারে এসে ঢুকল সে।

হেডকোয়ার্টার মানে তিরিশ ফুট লম্বা একটা ক্যারাভান, মোবাইল হোম। গত বছর কিনেছিলেন রাশেদ চাচা। অ্যাক্সিডেন্ট করেছিল ক্যারাভানটা। ভেঙে চুরে বেঁকে দুমড়ে একেবারে শেষ।

ইয়ার্ডের এক প্রান্তে ফেলে রাখা হয়েছে। চাচার কাছ থেকে ওটা ব্যবহারের অনুমতি নিয়ে নিয়েছে কিশোর। বোরিস আর রোভারের সাহায্যে মোটামুটি ঠিকঠাক করে নিজের অফিস বানিয়েছে।

পুরো বছর ধরেই মালপত্র এনে ক্যারাভান ট্রেলারটার চারপাশে ফেলেছে কিশোর। এ কাজেও তাকে সাহায্য করেছে বোরিস আর রোভার, মুসা আর রবিন তো আছেই। ইস্পাতের বার, ভাঙাচোরা ফায়ার-এস্কেপ, কাঠ আর দেখে-চেনার-জো-নেই এমন সব জিনিসপত্রের আড়ালে এখন একেবারে ঢাকা পড়ে গেছে ট্রেলারটা। ওটার কথা ভুলেই গেছেন রাশেদ চাচা। তিনটে কিশোর ছাড়া আর

কেউ জানে না, এই ট্রেলারের ভেতর কত কিছু গড়ে উঠেছে। তিন গোয়েন্দার অফিস ওটা। ল্যাবরেটরি আছে, ছবি প্রসেসিং-এর ডার্ক-রুম আছে। হেডকোয়ার্টার থেকে বেরোনর কয়েকটা পথও বানিয়ে নিয়েছে ওরা।

একটা ডেস্কের ওপাশে সুইভেল চেয়ারে বসে আছে কিশোর পাশা। ডেস্কের এক কোণ পোড়া। অন্যপাশে বসে আছে মুসা।

'দেরি করে ফেলেছ,' গম্ভীর গলায় বলল কিশোর। যেন ব্যাপারটা জানে না রবিন।

'চাকা পাংচার,' এখনও হাঁপাচ্ছে রবিন। 'লাইব্রেরি থেকে রওনা দেবার পর পরই পেরেক ঢুকেছে।'

'যে কাজ দিয়েছিলাম কিছু করেছ?'

'নিশ্চয়। অনেক কিছু জেনেছি টেরর ক্যাসলের ব্যাপারে।'

'টেরর ক্যাসল?' আপনমনেই বিড় বিড় করল মুসা। 'নামটাই অপছন্দ লাগছে আমার, কেমন যেন গা ছম ছম করে!'

'নাম শুনেই ছমছম, আসল কথা তো শোনইনি এখনও,' বলল রবিন। 'পাঁচজন লোকের একটা পরিবার রাত কাটাতে গিয়েছিল ওখানে। তারপর...'

'একেবারে গোড়া থেকে শুরু কর,' বলল কিশোর। 'গালগল্প বাদ দিয়ে সত্যি ঘটনাগুলো শুধু।'

'ঠিক আছে।' সঙ্গে করে নিয়ে আসা বড় একটা বাদামী খাম খুলছে রবিন। 'কিন্তু তার আগে শুঁটকো টেরির কথাটা জানানো দরকার। সেই সকাল থেকেই আমার পেছনে লেগেছিল ব্যাটা। আমি কি করছি না করছি, জানার চেষ্টা করেছে।'

'ইয়াল্লা?' ব্যাটাকে জানতে দাওনি তো কিছু!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল মুসা। 'পেছন থেকে কি করে যে সরাই! খালি নাক গলাতে আসে আমাদের কাজে!'

'না, ওকে কিছু বলিনি আমি,' বলল রবিন। 'কিন্তু আঠার মত সঙ্গে লেগে ছিল ব্যাটা। লাইব্রেরিতে ঢুকতে যাচ্ছি, আমাকে থামাল শুঁটকো। কিভাবে রোলস-রয়েসটা পেল কিশোর জানতে চাইল। জিজ্ঞেস করল, তিরিশ দিন কোথায় কোথায় যাচ্ছি আমরা।'

'তারপর?' জানতে চাইল কিশোর।

'লাইব্রেরিতে আমার সঙ্গে সঙ্গে ঢুকল ব্যাটা,' নাক কোঁচকাল রবিন। 'আমার দিক থেকে চোখ সরাল না মুহূর্তের জন্যেও। দেখল, পুরানো পত্রিকা আর ম্যাগাজিন ঘাঁটাঘাঁটি করছি আমি। কি পড়ছি, দেখতে দিইনি ওকে। কিন্তু...'

'কিন্তু কি?'

'আমাদের কার্ড। যেটার পেছনে টেরর ক্যাসল লিখেছিলে তুমি...'

'হারিয়েছে, না? টেবিলে রেখেছিলে, কাজ করে ফিরে এসে আর পাওনি,' বলল কিশোর।

'তুমি জানলে কি করে?' রবিন অবাক।

'সহজ। না হারালে ওটার কথা তুলতে না তুমি।'

'টেবিলে রেখে ক্যাটালগ গোছাচ্ছিলাম,' বলল রবিন। 'মনে পড়তেই তুলে নিতে এলাম। পেলাম না। অনেক খুঁজেছি। শুঁটকো নিয়েছে, এটাও জোর দিয়ে বলতে পারছি না। তবে বেরিয়ে যাবার সময় ব্যাটাকে খুব খুশি খুশি মনে হয়েছে।'

'শুঁটকোর কথা যথেষ্ট হয়েছে,' বলল কিশোর। 'একটা জরুরি কাজ হাতে নিয়েছি আমরা। সময় নষ্ট করা চলবে না। টেরর ক্যাসলের ব্যাপারে কি জানলে, বল।'

'বেশ,' শুরু করল রবিন। 'হলিউড ছাড়িয়ে গেলে একটা সরু গিরিপথ পাওয়া যাবে। নাম ব্ল্যাক ক্যানিয়ন। ওই গিরিপথের এক ধারে পাহাড়ের ঢালে তৈরি হয়েছে টেরর ক্যাসল। এটার নাম ছিল আসলে ফিলবি ক্যাসল। বিখ্যাত অভিনেতা জন ফিলবির বাড়ি সে-ই তৈরি করিয়েছিল। নির্বাক-সিনেমার যুগে লোকের মুখে মুখে ফিরত ফিলবির নাম।' থামল রবিন।

বলে যাবার ইঙ্গিত করল কিশোর।

'টেরর ছবিতে অভিনয় করত ফিলবি। এই ভ্যাম্পায়ার কিংবা ওয়্যারউলভস্ মার্কা ছবিগুলো আরকি। ওসব ছবিতে সাধারণত পোড়ো বাড়ি দরকার পড়েই। প্ল্যান করে ওই মডেলেরই একটা বাড়ি তৈরি করল ফিলবি। ঘরে ঘরে ভরল যত্তোসব উদ্ভট জিনিস। মমির কফিন, বহু পুরানো লোহার বর্ম, মানুষের কঙ্কাল, এমনি সব জিনিস। কোনটাই কিনতে হয়নি তাকে। ছবিতে ব্যবহার হয়ে যাবার পর প্রযোজকের কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছে।'

'ভরসা পাচ্ছি,' আস্তে করে বলল কিশোর।

'শেষতক শোন আগে,' বলল মুসা। 'তা জন ফিলবির কি হল?'

'আসছি সে কথায়,' বলল রবিন। 'লক্ষমুখো মানব নামে সারা দুনিয়ায় খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল ফিলবির। এই সময়েই এল সবাক সিনেমা। চমৎকার অভিনয় ফিলবির, কিন্তু কথা বলতে গেলেই গুবলেট হয়ে যায়। চি-চি গলার স্বর! শুধু তাই না, জোরে বলতে গেলে কথা জড়িয়ে যায়। কখনও কোন শব্দের বেলায় তোতলায়ও।'

'ই-স্-স্!' আফসোস করে উঠল মুসা। 'চি-চি করা ওই তোতলা ভূতকে সিনেমায় যদি দেখতে পেতাম! হাসতে হাসতে নিশ্চয় পেট ব্যথা হয়ে যেত লোকের!'

'তা-ই হত,' সায় দিল রবিন। 'ছবিতে অভিনয় বন্ধ করে দিল ফিলবি। বেহিসেবী খরুচে ছিল সে। জমানো টাকা পয়সা তেমন ছিল না। কাজ নেই, টাকাও আসে না। একে একে সবকটা কাজের লোককে বিদেয় করে দিতে বাধ্য হল। সব শেষে বিদেয় করল তার বিজনেস ম্যানেজার হ্যারি প্রাইসকে। লোকের

সঙ্গে ফোনে কথা বলা বন্ধ করে দিল। ফোন আসে, ধরে না, চিঠি আসে, জবাব দেয় না। নিজেকে গুটিয়ে নিল ক্যাসলের সীমানায়। ধীরে ধীরে অভিনেতা ফিলবিকে ভুলে গেল লোকে।' থামল রবিন। দম নিয়ে আবার বলতে লাগল, 'তারপর একদিন, হলিউডের মাইল পঁচিশেক উত্তরে পড়ে থাকতে দেখা গেল একটা গাড়ি। ভেঙে চুরে দুমড়ে আছে। পাহাড়ী পথ থেকে নিচের পাথুরে সৈকতে পড়ে গিয়ে ওই অবস্থা হয়েছে ওটার। চুরচুর হয়ে গেছে কাচ। ভেঙে, খুলে দশহাত দূরে ছিটকে পড়েছে একটা দরজা।'

'ওই গাড়ির সঙ্গে ফিলবির সম্পর্ক কি?' রবিনের কথার মাঝেই প্রশ্ন করে বসল মুসা।

লাইসেন্স নাম্বার দেখে পুলিশ জানতে পারল, গাড়িটা ফিলবির,' ব্যাখ্যা করল রবিন। 'অভিনেতার লাশ পাওয়া যায়নি। এতে অবাক হবারও কিছু নেই। নিশ্চয় খোলা দরজা দিয়ে বাইরে ছিটকে পড়েছিল দেহটা। তারপর জোয়ারের সময় ভেসে গেছে সাগরে।'

'আহ্-হা!' দুঃখ প্রকাশ পেল মুসার গলায়। 'তোমার কি মনে হয়? ইচ্ছে করেই অ্যাক্সিডেন্ট করেছিল লোকটা?'

'শিওর না,' জবাব দিল রবিন। 'গাড়িটা সনাক্ত করার পরই ক্যাসলে গিয়ে উঠল পুলিশ। সদর দরজা খোলা। ভেতরে কেউ নেই। পুরো ক্যাসল খুঁজল পুলিশ। কোন লোককেই পাওয়া গেল না। লাইব্রেরিতে একটা টেবিলে পেপারওয়েট চাপা দেয়া একটা নোট পাওয়া গেল,' কপি করে আনা নোটটা বাদামী খামের ভেতর থেকে খুলে পড়ল রবিনঃ 'লোকে আর কোনদিনই জীবন্ত দেখতে পাবে না আমাকে। কিন্তু তাই বলে একেবারে হারিয়ে যাব না আমি। আমার আত্মা ঠিকই বিচরণ করবে তোমাদের মাঝে। আর, মরার পরেও আমার সম্পত্তি হয়ে রইল টেরর ক্যাসল। ওটা এই মুহূর্ত থেকে একটা অভিশপ্ত দুর্গ।—জন ফিলবি।'

'ইয়াল্লা!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল মুসা। 'দুর্গটার ব্যাপারে যতই শুনছি, ততই অপছন্দ করছি ওটাকে!'

'থামলে কেন?' রবিনকে বলল কিশোর। 'বলে যাও।'

'ক্যাসলের আনাচে-কানাচে কোথাও খোঁজা বাকি রাখল না পুলিশ। না, ফাঁকি ঝুঁকি কিছুই নেই। গাড়িটা ভেঙে ফেলে দিয়ে এসে বাড়িতে লুকিয়ে বসে থাকেনি ফিলবি। পরে জানা গেল, ব্যাংকে পাহাড়-প্রমাণ ঋণ হয়ে আছে তার। বাড়িটা মর্টগেজ রয়েছে ব্যাংকের কাছে। ফিলবি আত্মহত্যা করেছে, শিওর হয়ে নিয়ে ক্যাসলে লোক পাঠাল ব্যাংক। তার জিনিসপত্র সব তুলে নিতে এল ওরা। কিন্তু অদ্ভুত একটা ব্যাপার ঘটল। কেন জানি থতমত খেয়ে গেল লোকেরা বাড়িতে ঢুকেই। উদ্ভট কিছু শব্দ শুনল ওরা, আজব কিছু চোখে পড়ল। কিন্তু কি শুনেছে,

কি দেখেছে, পরিষ্কার করে বলতে পারল না। মালপত্র আর বের করা হল না। নিজেরাই ছুটে বেরিয়ে এল। বাড়িটা বিক্রির সিদ্ধান্ত নিল এরপর ব্যাংক। লাভ হল না। লোকে থাকতেই চায় না ক্যাসলে, কিনতে যাবে কে শুধু শুধু? যে-ই ঢোকে বাড়িটাতে, খানিক পরেই কেমন অস্বস্তি বোধ করতে শুরু করে।' থেমে দুই বন্ধুর দিকে একবার চেয়ে নিল রবিন। কিশোরের কোন রকম ভাব পরিবর্তন নেই। হাঁ করে আছে মুসা। আবার বলল সে, 'সস্তায় এতবড় একটা বাড়ি কেনার লোভ ছাড়তে পারল না একজন এস্টেট এজেন্ট। ভূত-ফুত কিছু নেই, সব বাজে কথা!—প্রমাণ করতে এগিয়ে চলল সে। ঠিক করল, রাত কাটাবে ফিলবি ক্যাসলে। সাঁঝের আগেই ক্যাসলে ঢুকল সে। মাঝরাত পেরোনর আগেই পাগলের মত ছুটে বেরিয়ে এল। ব্ল্যাক ক্যানিয়ন পেরোনর আগে একবারও আর পেছন ফিরে তাকায়নি।'

খুব সন্তুষ্ট মনে হচ্ছে কিশোরকে। কিন্তু চোখ বড় হয়ে গেছে মুসার। রবিন তার দিকে চাইতেই ঢোক গিলল।

'বলে যাও,' অনুরোধ করল কিশোর। 'যা আশা করেছিলাম, বাড়িটা তার চেয়ে অনেক বেশি ভূতুড়ে।'

'এরপর আরও কয়েকজন ক্যাসলে রাত কাটানর চেষ্টা করেছে,' জানাল রবিন। 'একজন উঠতি অভিনেত্রী পাবলিসিটির জন্যে রাত কাটাতে গেল ওখানে। সে বেরিয়ে এল মাঝরাত হবার অনেক আগেই। শীত ছিল না, তবু দাঁতে দাঁত বাড়ি খাচ্ছিল তার। কোটর থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসতে চাইছিল চোখ। স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল আতঙ্কে। তখন কোন কথাই বেরোয়নি মুখ দিয়ে। পরে জানিয়েছে, একটা নীল ভূতের দেখা পেয়েছে। আর কেমন একধরনের কুয়াশা নাকি ঢেকে ফেলছিল তাকে। অভিনেত্রী এর নাম দিয়েছে ফগ অব ফিয়ার।'

'নীল ভূত, আবার কুয়াশাতঙ্কও! ইয়াল্লা!' শুকনো ঠোঁটে জিভ বুলিয়ে ভেজাবার চেষ্টা করল মুসা। 'আর কিছু দেখা গেছে? মাথা ছাড়া ঘোড়সওয়ার, শেকলে-বাঁধা-কঙ্কাল...'

'রবিনকে কথা শেষ করতে দাও,' বাধা দিয়ে বলল কিশোর।

'আমার আর কিছু শোনার দরকার নেই,' মুসার মুখ ফ্যাকাসে। 'যা শুনেছি, এতেই বুক ধড়ফড় শুরু হয়ে গেছে!'

মুসার কথায় কান দিল না কিশোর। রবিনকে জিজ্ঞেস করল, 'আর কিছু বলবে?'

'হ্যাঁ,' আবার বলতে লাগল রবিন। 'একের পর এক ভূতুড়ে কাণ্ড ঘটেই চলল ফিলবি ক্যাসলে। পুবের কোন এক শহর থেকে নতুন এল একটা পরিবার। পাঁচজন সদস্য। থাকার জায়গা খুঁজছে। ব্যাংক ধরল ওদেরকে। পুরো একবছর ক্যাসলে থাকার অনুমতি দিল। এক পয়সা ভাড়া চায় না। শুধু বাড়িটার বদনাম

ঘোচাতে চায় ব্যাংক। খুশি মনেই ক্যাসলে গিয়ে উঠল পরিবারটা। রাত দুপুরে বেরিয়ে এল হুড়োহুড়ি করে। ক্যাসল তো ক্যাসল, সে-রাতেই শহর ছেড়ে পালাল ওরা। রকি বীচে আর কোনদিন দেখা যায়নি ওদের।'

'গোলমালটা শুরু হয় ঠিক কোন সময় থেকে?' জানতে চাইল কিশোর।

'রাতের শুরুতে সব চুপচাপ। মাঝরাতের কয়েক ঘন্টা আগে থেকে ঘটতে শুরু করে ঘটনা। দূর থেকে ভেসে আসে গোঙানির শব্দ। হঠাৎ করেই হয়ত সিঁড়িতে একটা আবছামূর্তি দেখা যায়। কখনও শোনা যায় দীর্ঘশ্বাস। অনেক সময় ক্যাসলের মেঝের তলা থেকে উঠে আসে চাপা চিৎকার। মিউজিক রুমে একটা অরগান পাইপ আছে, নষ্ট। মাঝরাতে হঠাৎ করে নাকি বেজে ওঠে ওটা, শুনেছে অনেকে। বাদককেও দেখেছে কেউ কেউ। অর্গানের সামনে বসে থাকে, আবছা একটা মূর্তি, শরীর থেকে নীল আলো বিচ্ছুরিত হয়! এর নামও দিয়ে ফেলেছে লোকেঃ নীল অশরীরী?'

'নিশ্চয় তদন্ত করে দেখা হয়েছে এসব?'

'হয়েছে,' নোট দেখে বলল রবিন। 'দু'জন প্রফেসর গিয়েছিলেন। তাঁরা কিছুই দেখতে পাননি। শোনেনওনি কিছু। তবে অদ্ভুত একটা ব্যাপার ঘটেছে। কেমন অস্বস্তি বোধ করেছেন সারাক্ষণ। দু'জনেই উদ্বিগ্ন, উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন। বেরিয়ে এসে জানিয়েছেনঃ অদ্ভুত কিছু একটা রয়েছে ক্যাসলে। কিছুই করতে পারল না ব্যাংক। না পারল বাড়িটা বেচতে, না পারল ভাড়া দিতে। মালপত্রগুলোও বের করে আনা গেল না। ক্যাসলে যাবার পথ আটকে দিল ব্যাংক। ব্যস। তারপর থেকে ওভাবেই পড়ে আছে ক্যাসলটা।' কিশোরের দিকে চেয়ে বলল রবিন, 'বিশ বছরে একটা পুরো রাত কেউ কাটাতে পারেনি ওর ভেতর। শেষে কয়েকজন ভবঘুরে মাতাল বাড়িটাতে আস্তানা গাড়ার চেষ্টা করেছিল, তাতেও বাধা দেয়নি ব্যাংক। কিন্তু প্রথম রাতেই পালাল মাতালেরা। ভূতে তাড়া করে দুর্গ থেকে বের করে আনল ওদের। সারা শহরে ছড়িয়ে দিল ওরা সে-কাহিনী। ক্যাসলের ত্রিসীমানায় ঘেঁষা বন্ধ করে দিল লোকে। ফিলবিক্যাসলের নাম হয়ে গেল টেরর ক্যাসল। এসব অনেক বছর আগের ঘটনা। কিন্তু আজও লোকে মাড়ায় না ওদিকটা।'

'ঠিকই করে,' বলে উঠল মুসা। 'আমিও যাব না, লাখ টাকা দিলেও না।'

'আজ রাতেই আমরা যাব ওখানে,' ঘোষণা করল কিশোর। 'সঙ্গে ক্যামেরা আর টেপ-রেকর্ডার নিয়ে যাব। সত্যিই ভূত আছে কিনা ক্যাসলে, দেখতে চাই। পরে আঁট ঘাট বেঁধে তদন্তে নামব। দুর্গটার ভীষণ বদনাম আছে। জায়গাটাও খারাপ। ভুতুড়ে ছবির শুটিঙের জন্যে এরচে ভাল জায়গা আর পাবেন না মিস্টার ক্রিস্টোফার। হলপ করে বলতে পারি।'

চার

টেরর ক্যাসলের পুরো ইতিহাস লিখে এনেছে রবিন।

সারাটা বিকেল খুঁটিয়ে সব পড়ল কিশোর। তারপর উঠল, ক্যাসলে যাবার জন্যে তৈরি হল।

সারাক্ষণই 'যাব না যাব না' করল মুসা। কিন্তু শেষে দেখা গেল, সে-ও তৈরি হয়ে এসেছে। পুরানো এক সেট কাপড় পরেছে। সঙ্গে নিয়েছে তার পুরানো টেপরেকর্ডারটা।

পকেটে নোটবুক নিল রবিন। আর নিল চোখা-করে-শিশতোলা পেন্সিল। ফ্ল্যাশগান সহ ক্যামেরা কাঁধে ঝুলিয়ে নিল কিশোর।

খাওয়া-দাওয়া সেরে এসেছে তিনজনেই। মুসা আর রবিন বাড়িতে বলে এসেছে, রোলস-রয়েসে চড়ে হাওয়া খেতে যাচ্ছে। দু'জনের বাবা-মা কেউই আপত্তি করেননি। কিশোরও বেড়াতে যাবার অনুমতি নিয়েছে চাচির কাছ থেকে।

আঁধার নামল। স্যালভিজ ইয়ার্ডের গেটের বাইরে এসে দাঁড়াল তিন গোয়েন্দা। আগেই টেলিফোন করে দেয়া হয়েছে রেন্ট-আ-রাইড কোম্পানিতে। রোলস রয়েসের বিশাল জ্বলন্ত দুই চোখ দেখা গেল মোড়ের মাথায়। দেখতে দেখতে কাছে এসে দাঁড়াল গাড়ি।

গাড়িতে উঠে বসল তিন কিশোর।

কোথায় যাবে জানতে চাইল হ্যানসন।

কোলের ওপর একটা ম্যাপ বিছিয়ে নিয়েছে কিশোর। একটা জায়গায় আঙুল রেখে হ্যানসনকে দেখিয়ে বলল, 'ব্ল্যাক ক্যানিয়ন। এই যে, এ পথে যেতে হবে।'

'ঠিক আছে, মিস্টার পাশা।'

অন্ধকারে নিঃশব্দে ছুটে চলল রোলস রয়েস। ধীরে ধীরে ওপরে উঠে যাচ্ছে পাহাড়ী পথ ধরে। এক পাশে নিচে গভীর খাদ। খানিক পর পরই তীক্ষ্ণ মোড় নিয়েছে পথ। কিন্তু দক্ষ ড্রাইভার হ্যানসন। তার হাতে নিজেদের ভার ছেড়ে দিয়ে একেবারে নিশ্চিন্ত তিন কিশোর।

'আজ রাতে তদন্ত করার ইচ্ছে নেই,' পাশে বসা দুই সঙ্গীকে বলল কিশোর। 'শুধু দেখে আসব দুর্গটা। উদ্ভট কিছু চোখে পড়লে তার ছবি তোলার চেষ্টা করব। আর তুমি, মুসা, আজব যে-কোন শব্দ রেকর্ড করে নেবে টেপে।'

'আমাকে রেকর্ড করতে দিলে,' থেমে গেল মুসা। আরেকটা তীক্ষ্ণ মোড় নিল গাড়ি। নিচের অন্ধকার খাদের দিকে চেয়ে শিউরে উঠল একবার। তারপর ফিরল আবার কিশোরের দিকে। 'হ্যাঁ, আমাকে রেকর্ড করতে দিলে শুধু দাঁতে দাঁতে বাড়ি খাবার শব্দ উঠবে, আর কিছু না।'

'রবিন,' মুসার কথায় কান না দিয়ে বলল কিশোর। 'তুমি গাড়িতে থাকবে। আমাদের ফেরার অপেক্ষা করবে।'

'একেবারে আমার পছন্দসই কাজ,' খুশি হয়ে বলল রবিন। জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে আছে। 'ইস্‌স্‌, দেখেছ কি অন্ধকার!'

অন্ধকার গিরিপথে ঢুকে পড়েছে গাড়ি। দু'ধারে খাড়া উঠে গেছে পাহাড়। বার বার এঁকেবেঁকে এগিয়ে গেছে পথটা। কোথাও একবিন্দু আলো দেখা যাচ্ছে না। ঘুটঘুটে অন্ধকার। একটা বাড়ি-ঘর চোখে পড়ছে না কোথাও।

'ব্ল্যাক ক্যানিয়নের নাম যে-ই রাখুক, ঠিকই রেখেছে,' চাপা গলায় বলল মুসা।

'সামনে বাধা দেখতে পাচ্ছি!' বলে উঠল কিশোর।

ঠিকই! সামনে পথ বন্ধ। পাথর আর মাটির স্তূপ। দু'ধারে পাহাড়ের গায়ে ঘন হয়ে জন্মে আছে মেলকোয়াইটের ঝোপ, কিন্তু ঘাসের নাম গন্ধও নেই। ফলে রোদ-বৃষ্টি বাতাসে আলগা হয়ে গেছে মাটি, পাথর। গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ে জমা হয়েছে পথের ওপর। স্তূপের ভেতর থেকে উঁকি দিয়ে আছে একটা ক্রসবারের মাথা। কোন এককালে লোক চলাচল ঠেকানর জন্যে লাগানো হয়েছিল। এখন আর বারের দরকার নেই। তার চেয়ে ভাল ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে মাটি আর পাথর।

স্তূপের কাছে এসে গাড়ি থামিয়ে দিল হ্যানসন। 'আর যাবে না,' বলল সে। 'তবে আপনাদের তেমন অসুবিধে হবে বলেও মনে হয় না। ম্যাপে দেখছি, কয়েকশো গজ এগিয়ে একটা মোড় ঘুরলেই পৌঁছে যাবেন ক্যাসলে।'

'তা ঠিক,' সায় দিল কিশোর। 'আমরা নেমেই যাচ্ছি। মুসা, এস।'

'নেমে এল দু'জনে। গাড়ি ঘুরিয়ে রাখছে হ্যানসন।'

'ঘন্টাখানেকের ভেতরেই ফিরব আমরা,' ডেকে হ্যানসনকে বলল কিশোর।

এগিয়ে চলল দুই গোয়েন্দা।

'খাইছে!' সঙ্কিত গলায় বলে উঠল মুসা। 'দেখেই গা ছম ছম করছে!' দাঁড়িয়ে পড়েছে সে।

দাঁড়িয়ে পড়ল কিশোরও। অন্ধকারে সামনে তাকাল। গিরিপথের শেষ প্রান্তে একটা পাহাড়ের ঢালে দাঁড়িয়ে আছে অদ্ভুত এক কাঠামো। তারাখচিত আকাশের পটভূমিতে বেশ স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে ওটা। বিশাল মোটা পাথরের একটা থাম যেন উঠে গেছে আকাশের দিকে। থামের চূড়ায় একটা রিঙ পরিয়ে দেয়া হয়েছে যেন। টেরর ক্যাসলের টাওয়ার। শুধু টাওয়ারটাই, ক্যাসলের আর বিশেষ কিছুই নজরে পড়ছে না এখান থেকে।

'দিনের বেলা এলেই ভাল হত,' বিড় বিড় করে বলল মুসা।

মাথা নাড়ল কিশোর। না। 'দিনে কিছু ঘটে না ক্যাসলে। ভূতপ্রেতগুলো বেরোয় রাতের বেলা।'

'ভূতের তাড়া খেতে চাই না আমি। এমনিতেই প্যান্ট নষ্ট করার সময় হয়ে এসেছে।'

'আমারও,' স্বীকার করল কিশোর। 'পেটের ভেতর কেমন সুড়সুড়ি লাগছে। কয়েক ডজন প্রজাপতি ঢুকে পড়েছে যেন!'

'তাহলে চল ফিরে যাই,' সুযোগ পেয়ে বলল মুসা। হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছে যেন। 'এক রাতে অনেক দেখা হয়েছে চল, হেডকোয়ার্টারে ফিরে গিয়ে নতুন কোন প্ল্যান ঠিক করি।'

'প্ল্যান তো ঠিকই আছে,' বলল কিশোর। 'একটা শেষ না করেই আরেকটা কেন?'

পা বাড়াল কিশোর। এগিয়ে চলল ক্যাসলের দিকে। মাঝে মাঝে টর্চ জ্বেলে পথ দেখে নিচ্ছে। প্রায় খাড়া হয়ে উঠে গেছে পথটা। আলগা পাথরের ছড়াছড়ি। ছোট বড় মাঝারি, সব আকারের। হড়কে যাচ্ছে পা, কখনও হোঁচট খাচ্ছে। কিন্তু থামল না গোয়েন্দা প্রধান।

কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করল মুসা। তারপর পিছু নিল কিশোরের। তার হাতেও টর্চ।

'এমন অবস্থায় পড়ব জানলে,' কিশোরের কাছাকাছি হয়ে ক্ষুণ্ন গলায় বলল মুসা। 'গোয়েন্দা হওয়ার কথা কল্পনাও করতাম না!'

'কেসটা মিটে গেলেই অন্য রকম মনে হবে,' বলল কিশোর। 'কেউকেটা গোছের কিছু মনে হবে নিজেকে। প্রথম কেসেই কিরকম নাম হবে তিন গোয়েন্দার, ভেবে দেখেছ?'

'কিন্তু ভূতের সামনে যদি পড়ে যাই? কিংবা নিল অশরীরী তাড়া করে? দুয়েকটা দৈত্য-দানবের বাচ্চা এসে ঘাড় চেপে ধরলেও আশ্চর্য হব না!'

'ওরা আসুক, তা-ই আমি চাই,' বলতে বলতে কাঁধে ঝোলানো ক্যামেরার গায়ে আলতো চাপড় দিল কিশোর। 'ব্যাটাদের ছবি তুলে নেব। বিখ্যাত হয়ে যাব রাতারাতি।

বিখ্যাত হবার আগেই যদি ঘাড়টা মটকে দেয়?'

'শ্ শ্ শ্!' ঠোঁটে আঙুল রেখে হুঁশিয়ার করে দিল সঙ্গীকে কিশোর। আচমকা দাঁড়িয়ে পড়েছে। নিভিয়ে দিয়েছে টর্চ।'

পাথরের মত স্থির হয়ে গেল মুসা। হঠাৎ আলো নিভে যাওয়ায় অন্ধকার যেন আরও বেশি করে চেপে ধরল চারদিক থেকে।

কেউ, কিংবা কিছু একটা, এদিকেই নেমে আসছে। সোজা ছেলে দুটোর দিকে।

অদ্ভুত পায়ের আওয়াজ। চাপা, মৃদু। সেই সঙ্গে পায়ের আঘাতে ছোট ছোট পাথর গড়িয়ে পড়ার কেমন সুরেলা শব্দ।

ক্যামেরা হাতে তৈরি হয়ে আছে কিশোর। আরও এগিয়ে এল পায়ের শব্দ, আরও। হঠাৎ ঝিলিক দিয়ে উঠল ফ্ল্যাশ-গানের তীব্র নীলচে-সাদা আলো। ক্ষণিকের জন্যে বড় বড় দুটো টকটকে লাল চোখ চোখে পড়ল। লাফিয়ে লাফিয়ে এগিয়ে আসছে চোখের মালিক। আরেক মুহূর্ত পরেই তাদের কাছে এসে গেল ওটা। পরক্ষণেই আরেক লাফে বেরিয়ে গেল পাশ কেটে। পাথর গড়ানর আওয়াজ তুলে লাফাতে লাফাতে চলে গেল জীবটা।

'খরগোশ!' বলল কিশোর। 'খরেই বোঝা গেল, হতাশ হয়েছে। জানোয়ারটাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছি আমরা।'

'আমরা দিয়েছি!' চেঁচিয়ে উঠল মুসা। 'আমাদেরকে দেয়নি ব্যাটা? আরেকটু হলেই তো ভিরমি খেয়ে পড়েছিলাম!'

'ও কিছু না। রাতের বেলা রহস্যজনক শব্দ আর নড়াচড়ার ফলে নার্ভাস সিস্টেমের ওপর বিশেষ প্রতিক্রিয়া। ঘটেই থাকে এমন,' বন্ধুকে অভয় দিল কিশোর। 'চল, এগোই।' মুসার হাত ধরে টান দিল সে। 'আর চুপি চুপি এগিয়ে লাভ নেই। ফ্ল্যাশারের আলোয় নিশ্চয় চমকে গেছে ভূতগুলো, যদি থেকে থাকে।'

'তাহলে কি গান গাইতে গাইতে এগোব?' মোটেই এগোনর ইচ্ছে নেই মুসার। পেছনে পড়ে গেছে। 'এতে একটা উপকার হবে। ভূতের গোঙানি, দীর্ঘশ্বাস, কিছুই কানে ঢুকবে না।'

'কানে ঢুকুক, তা-ই চাই আমি,' দৃঢ় শোনাল কিশোরের গলা। 'সব শুনতে চাই আমি। চেঁচানি, দীর্ঘশ্বাস, খসখস, শেকলের ঝনঝনানি ভূতেরা যতরকম শব্দ ব্যবহার করে, সব।'

মুসার মনের ভাব ঠিক উল্টো। কিন্তু বলল না আর কিছু। জানে লাভ নেই বলে। বন্ধুকে চেনে সে। একবার যখন সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে, দুর্গে ঢুকবেই কিশোর পাশা। কোন বাধাই এখন ঠেকাতে পারবে না তাকে। চুপচাপ সঙ্গীর পিছু পিছু এগিয়ে চলল মুসা।

যতই এগোচ্ছে ওরা, আকাশের পটভূমিতে ধীরে ধীরে বড় হচ্ছে টাওয়ারটা। কাসলের অন্যান্য অংশও চোখে পড়ছে এখন। আবছাভাবে নিজের অজান্তেই শিউরে উঠল একবার মুসা। কি কি ঘটায় ওখানে ভূতেরা, সব বলেছে রবিন। ওই কথাগুলোই বারবার ঘুরে ফিরে মনে আসছে গোয়েন্দা সহকারীর। ভুলে থাকতে চাইছে, পারছে না।

দুর্গ ঘিরে থাকা উঁচু পাথরের দেয়ালের কাছে এসে দাঁড়াল ওরা। থামল এক মুহূর্ত। তারপর গেট দিয়ে ঢুকে পড়ল দুর্গ প্রাঙ্গনে।

'এসে গেলাম,' থেমে দাঁড়িয়েছে কিশোর।

বড় টাওয়ারটার পাশেই আরেকটা ছোট টাওয়ার। এটার মাথা চোখা। এমনি ছোট ছোট আরও কয়েকটা টাওয়ার। রয়েছে এদিক-ওদিক। জানালায় জানালায়

কাচের শার্সি, তারার আলোয় চিক চিক করছে ম্লানভাবে। মুসার মনে হচ্ছে, ওগুলো জানালা নয়, ভূতের চোখ। তার দিকে চেয়ে মুখ টিপে হাসছে।

কোনরকম জানান না দিয়ে হঠাৎ উড়ে এল ওটা। কালো একটা ছায়া, নিঃশব্দে। আঁতকে উঠে মাথা নুইয়ে ফেলল মুসা। চেঁচিয়ে উঠল, 'ইয়াল্লা! বাদুড়!'

'বাদুড়েরা শুধু পোকামাকড় খায়,' মনে করিয়ে দিল কিশোর। 'অত ভয় পাওয়ার কিছু নেই।'

'এটা হয়ত রুচি বদলাতে চায়। সুযোগ দিয়ে লাভ কি? ড্রাকুলার প্রেতাত্মাও তো হতে পারে!'

সঙ্গীর কথায় কান না দিয়ে আঙুল তুলে সামনে প্রাসাদের গায়ে বসানো বিরাট দরজা দেখাল কিশোর। 'চল, ঢুকে পড়ি।'

'আমার পা কথা শুনবে বলে মনে হয় না। কেবলই পেছনে চলতেই চাইছে ও দুটো।

'আমার দুটোও,' স্বীকার করল কিশোর। 'জোর করে কথা শোনাতে হবে। এস।'

পা বাড়াল কিশোর।

ভয়ানক ওই ক্যাসলে বন্ধুকে একা ঢুকতে দেয়া উচিত হবে না। পেছনে চলল মুসাও।

মার্বেলের সিঁড়ি ভেঙে একটা চওড়া বারান্দায় উঠে এল দু'জনে। দরজার নবের দিকে হাত বাড়াতেই কিশোরের কব্জি চেপে ধরল মুসা। 'থাম! শুনতে পাচ্ছ! বাজনা বাজাচ্ছে কেউ!'

কান পাতল দু'জনেই। লক্ষ লক্ষ মাইল দূর থেকে আসছে যেন অদ্ভুত কিছু শব্দের আভাস। এক মুহূর্ত। তারপরই হারিয়ে গেল শব্দগুলো। এখন শোনা যাচ্ছে আঁধার রাতের পরিচিত সব আওয়াজ। পোকামাকড়ের কর্কশ ডাক। হুহু বাতাসে মাঝেমধ্যে পাহাড়ের পাথুরে গা বেয়ে গড়িয়ে পড়া ছোট্ট পাথরের চাপা টুকুর-টাকুর।

'শুধুই কল্পনা,' গলায় জোর নেই কিশোরের। 'এমনও হতে পারে, গিরিপথের ওপারে কোন বাড়িতে টেলিভিশন চলছে। বাতাসে ভেসে এসেছে তার আওয়াজ। খালি বাতাসও হতে পারে। হাজারো রকম শব্দ করতে পারে বাতাস।'

'তা পারে,' বিড়বিড় করে বলল মুসা। তবে পাইপ অরগান হলেও অবাক হব না! হয়ত বাজানর নেশায় পেয়েছে এমুহূর্তে নীল ভূতকে!

'তাহলে চোখে দেখে শিওর হতে হবে,' বলল কিশোর। 'চল, ঢুকি!'

হাত বাড়িয়ে দরজার নব চেপে ধরল কিশোর। জোরে মোচড় দিয়ে ঠেলা দিতেই তীক্ষ্ণ একটা ক্যাঁ-এ-চ-চ আওয়াজ উঠল।

ভয়ানক জোরে বুকের খাঁচায় বাড়ি মারল একবার মুসার হৃৎপিণ্ড। পেছন

ফিরে দৌড় মারতে যাচ্ছিল, থেমে গেল শেষ মুহূর্তে। খুলে গেছে বিশাল দরজা। দরজার কব্জার আওয়াজ হয়েছে, বুঝতে পারল।

কিশোরের অবস্থাও বিশেষ সুবিধের নয়। বুকের ভেতর দুরদুর করছে তারও। ফিরে ছুট লাগাতে ইচ্ছে করছে। মনোবল পুরো ভেঙে পড়ার আগেই বন্ধুর হাত চেপে ধরল। তাকে নিয়ে ঢুকে পড়ল ভেতরে।

গাঢ় অন্ধকার গিলে নিল যেন দুই কিশোরকে। টর্চ জ্বালল ওরা। লম্বা এক হলঘরে এসে দাঁড়িয়েছে। হলের ওপাশে একটা দরজা। সেদিকে এগিয়ে চলল দু'জনে।

ভ্যাপসা গন্ধ। বাতাস ভারি। চারদিকে নাচছে যেন ছায়া ছায়া অশরীরীর দল। দরজাটা পেরিয়ে এল ওরা। বিরাট আরেকটা হলে এসে দাঁড়াল। দোতলা সমান উঁচু ছাত।

দাঁড়িয়ে পড়ল কিশোর। 'এসে গেছি। এটা মেইন হল। ঘন্টাখানেক থাকব এখানে। তারপর যাব।'

'যা-বো!' চাপা, কাঁপা কাঁপা গলায় কিশোরের কথার প্রতিধ্বনি করে উঠল কেউ। কানের কাছে ফিসফিস করে উঠল শব্দটা।

পাঁচ

'শুনলে!' থরথর করে কাঁপছে মুসা। ফিসফিস করতেও ভয় পাচ্ছে। 'ভূতটা আমাদের সঙ্গে যাবে বলছে! চল, পালাই!'

'থাম!' সঙ্গীর হাত খামচে ধরল কিশোর।

'থা-মো!' আবার শোনা গেল কাঁপা কাঁপা কথা।

'হুঁ, বুঝেছি,' বলল কিশোর। 'প্রতিধ্বনি,-আর কিছু না। খেয়াল করেছ কতবড় ঘর? দেয়ালের কোন কোণ নেই, ড্রামের দেয়ালের মত গোল। এতে শব্দ প্রতিধ্বনিত হয় খুব বেশি। ইচ্ছে করেই হয়ত এমন ঘর তৈরি করিয়েছে জন ফিলবি, কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে। নামও রেখেছে মিলিয়ে, ইকো রুম।'

'রু-ম!' কানের কাছে ফিসফিসিয়ে উঠল আবার কাঁপা প্রতিধ্বনি।

কিশোরের কথা ঠিক, বুঝতে পারল মুসা। ভয় কেটে যাচ্ছে। সাধারণ একটা ব্যাপার তাকে কি রকম ভয় পাইয়ে দিয়েছিল ভেবে লজ্জা পেল মনে মনে। ফিরে গিয়ে রবিনকে নিশ্চয় কথাটা বলবে কিশোর। তাকে নিয়ে হাসাহাসি করবে তাই বলল, 'আসলে, আগেই বুঝতে পেরেছি আমি। ভয় পাওয়ার ভান করছিলাম শুধু।' এবং কথাটা প্রমাণ করার জন্যেই জোরে হা-হা করে হেসে উঠল।

সঙ্গে সঙ্গে উঠল প্রতিধ্বনিঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হা আ-আ-আ! ধীরে ধীরে অনেক দূরে কোথাও মিলিয়ে গেল যেন শব্দের রেশ।

ঢোক গিলল মুসা। 'কাণ্ডটা আমি করলাম!' জোড়ে কথা বলতে ভয় পাচ্ছে, ফিসফিসিয়ে বলল।

'তো কে করল?' নিচু গলায় বলল কিশোর। 'যা করেছ, করেছ, আর কোরো না।'

'পাগল!' ফিসফিস করে বলল মুসা। 'কথাই বলব না জোরে!'

'কথা বলবে না কেন? এস,' টেনে সঙ্গীকে এক পাশে নিয়ে গেল কিশোর। ঘরের ঠিক মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে কথা বললে প্রতিধ্বনি হবে। এখানে বলতে পার নিশ্চিন্তে।'

'তাহলে আগে আমাকে বলে নিলেই পারতে!' ক্ষুণ্ণ মনে হল মুসাকে।

'আমি তো জানি প্রতিধ্বনির নিয়ম-কানুন সব তোমারও জানা আছে,' বলল কিশোর। 'পড়নি?'

'পড়েছি,' স্বীকার করল মুসা। 'কিন্তু ভুলে গিয়েছিলাম। আচ্ছা, পুবের কোন অঞ্চল থেকে এসেছিল একটা পরিবার, একটা রাতও কাটাতে পারেনি এখানে, ভেগেছে। কেন, বুঝেছ কিছু?'

'পশ্চিমে সুবিধে করতে পারবে না ভেবে হয়ত আবার পুবেই ফিরে গেছে,' নির্লিপ্ত গলা কিশোরের। তবে এটা ঠিক, বিশ বছরে কেউ পুরো একটা রাত কাটাতে পারেনি এখানে। আমাদের জানতে হবে, কি কারণে এত ভয় পেল ওরা!'

'কারণ আর কি? ভূত!' বলল মুসা। ঘরের চারদিকে টর্চের আলো ফেলছে সে। হলের এক প্রান্ত থেকে একটা সিঁড়ি উঠে গেছে দোতলায়! কিন্তু ওই সিঁড়ি বেয়ে ওপরে যাবার কোন ইচ্ছেই তার নেই। কোন কোন জায়গায় দেয়াল বিচিত্র রঙিন কাপড়ে ঢাকা, নষ্ট হয়ে গেছে কাপড়গুলো। তার নিচে কারুকাজ করা কাঠের বেঞ্চ পাতা। দেয়ালের গায়ে মাঝে মাঝেই ছোট ছোট চৌকোনা তাক। ওগুলোতে দাঁড় করিয়ে রাখা রয়েছে প্রাচিন বর্মপোশাক।

কয়েকটা বড় বড় ছবি ঝুলছে দেয়ালে। আলো ফেলে ফেলে প্রতিটি ছবি দেখছে মুসা। বিভিন্ন পোশাকে বিভিন্ন ভঙ্গিতে সব একজন লোকের ছবি। একটা ছবিতে সম্ভ্রান্ত এক ইংরেজের পোশাকে দেখা যাচ্ছে তাকে। পাশেই আরেকটাতে হয়ে গেছে কুঁজো অদ্ভুত পোশাক পরা একচোখা এক জলদস্যু।

অনুমান করল মুসা, ছবিগুলো দুর্গের মালিক, জন ফিলবির। সেই নির্বাক সিনেমার যুগের নাম করা কিছু ছবির দৃশ্য বড় করে এঁকে দেয়ালে সাজিয়ে রেখেছে অভিনেতা।

'চুপ করে থেকে এতক্ষণ বোঝার চেষ্টা করলাম,' হঠাৎ বলল কিশোর। 'কই, মুহূর্তের জন্যেও তো ভয় টের পেলাম না! তবে একটু কেমন কেমন যে করছে না, তা নয়!'

'আমারও,' জানাল মুসা। 'তবে ভয় ঠিক পাচ্ছি না। অনেক পুরানো একটা

বাড়িতে দাঁড়িয়ে থাকলে যেমন হয়, তেমনি অনুভূতি হচ্ছে।

'নোট পড়ে জেনেছি,' চিন্তিত দেখাচ্ছে কিশোরকে, 'লোকের ওপর প্রতিক্রিয়া ঘটাতে সময় নেয় টেরর ক্যাসল। শুরুতে হালকা এক ধরনের অস্বস্তিবোধ জন্মে। আস্তে আস্তে বাড়ে। প্রচণ্ড আতঙ্কে রূপ নেয় এক সময়।

কিশোরের শেষ কথাটা পুরোপুরি কানে ঢুকল না মুসার। দেয়ালে টাঙানো একটা ছবির ওপর আটকে গেছে তার দৃষ্টি। হঠাৎ এক ধরনের অস্বস্তিবোধ চেপে ধরছে তাকে। ক্রমেই বাড়ছে সেটা।

মুসার দিকে চেয়ে আছে একচোখা জলদস্যু! নষ্ট চোখটা গোল করে কাটা কালো কাপড়ে ঢাকা। কিন্তু ভাল চোখটা জ্যান্ত চোখের মতই চেয়ে আছে যেন তার দিকে। জ্বলছে। হালকা লালচে একটা আভা বিকিরণ করছে যেন! কিন্তু ও-কি! দ্রুত একবার চোখের পাতা পড়ল না!

'কিশোর।' গলা দিয়ে কোলা ব্যাঙের ঘড়ঘড়ে আওয়াজ বেরোল মুসার। 'ছবিটা!...আমাদের দিকেই চেয়ে আছে!'

'কোন ছবি!'

'ওই যে, ওটা!' টর্চের আলোর রশ্মি নাচিয়ে ছবিটা নির্দেশ করল মুসা। 'আমাদের দিকেই চেয়ে আছে।'

'দৃষ্টি বিভ্রম,' জবাব দিল কিশোর। 'ইচ্ছে করেই এমনভাবে আঁকে শিল্পি, মনে হয় দর্শকের দিকেই চেয়ে আছে চোখ। যেদিক থেকেই দেখ না কেন, তোমার দিকেই চেয়ে আছে মনে হবে।'

'কিন্তু...কিন্তু ওটা রঙে আঁকা চোখ নয়!' প্রতিবাদ করল মুসা। 'ওটা...ওটা সত্যিকারের চোখ...জ্যান্ত চোখ!'

'সে তোমার মনে হচ্ছে। ওটা রঙে আঁকা চোখই। চল, কাছ থেকে দেখি।'

ছবিটার কাছে এগিয়ে গেল কিশোর। একমুহূর্ত দ্বিধা করে শেষে তাকে অনুসরণ করল মুসা। দু'জনেই আলো ফেলল ছবির ওপর। ঠিক, কিশোরের কথাই ঠিক। রঙে আঁকা চোখ ওটা। তবে আঁকা হয়েছে দক্ষ হাতে। একেবারে জ্যান্ত মনে হচ্ছে।

'হ্যাঁ রঙে আঁকা।' চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা ঝোঁকাল মুসা। 'কিন্তু মেনে নিতে পারছি না!...চোখের পাতা পলক ফেলতে দেখছি...আরে।' হঠাৎ যেন কথা আটকে গেল তার। 'কিছু টের পাচ্ছ।'

'ঠাণ্ডা,' অবাক শোনাল কিশোরের গলা। 'ঠাণ্ডা একটা অঞ্চলে এসে ঢুকেছি আমরা। এরকম ঠাণ্ডা আবহাওয়া সব পোড়ো বাড়িতেই কিছু কিছু জায়গায় থাকে।'

'তাহলে স্বীকার করছ এটা পোড়ো বাড়ি!' রীতিমত কাঁপছে মুসা। দাঁতে দাঁতে বাড়ি খাওয়া শুরু হয়েছে। 'ভীষণ শীত করছে। মেরু অঞ্চলে এসে ঢুকলাম

নাকিরে বাবা। ভূত, সব ভূত এসে ঝাঁপিয়ে পড়ছে আমার ওপর। কিশোর, ভয় পাচ্ছি আমি!'

নিজেকে স্থির রাখার জোর চেষ্টা চালাচ্ছে মুসা। কিন্তু দাঁতে দাঁতে বাড়ি খাওয়া রোধ করতে পারছে না। কোথা থেকে গায়ে এসে লাগছে তীব্র ঠাণ্ডা হাওয়ার স্রোত। তারপরই চোখে পড়ল, বাতাসে হালকা ধোঁয়া। সূক্ষ্ম, অতি হালকা ধোঁয়ার ভেতর থেকে ধীরে ধীরে রূপ নিচ্ছে যেন একটা শরীর। মুহূর্তে ভয় প্রচণ্ড আতঙ্কে পরিণত হল। পাঁই করে ঘুরল মুসা। কথা শুনল না পা। তাড়িয়ে বের করে নিয়ে এল তাকে ঠাণ্ডা অঞ্চল থেকে। হল পার করে এনে বারান্দায় ফেলল। সেখান থেকে প্রায় উড়িয়ে নামিয়ে আনল সিঁড়ির নিচে, প্রাঙ্গনে, পথে। পেছনে তাড়া করে আসছে পায়ের শব্দ। আরও জোরে ছুটল মুসা।

ক্রমেই কাছে এসে যাচ্ছে পায়ের শব্দ। দেখতে দেখতে পাশে এসে গেল। হাল ছেড়ে দিল মুসা। পাশে চাইল। আরে! কিশোর!

অবাকই হল মুসা। তিন গোয়েন্দার নেতাকে কোন কারণে এত ভয় পেতে এর আগে কখনও দেখেনি সে।

'কি হল? তোমার পা-ও হুকুম মানছে না?' ছুটতে ছুটতেই জিজ্ঞেস করল মুসা।

'মানছে তো। ওদেরকে ছোটার হুকুম দিয়েছি আমি,' চেঁচিয়ে জাব দিল কিশোর।

থামল না ওরা। ছুটেই চলল। হাতে ধরা টর্চে ঝাঁকুনি লাগছে অনবরত, পথের ওপর অদ্ভুত ভঙ্গিতে নাচছে আলোর রশ্মি। টেরর ক্যাসলের কাছ থেকে দ্রুত সরে যাচ্ছে ওরা।

ছয়

ছুটতে ছুটতে বাঁকের কাছে চলে এল ওরা। গতি কমাল একটু। বাঁক ঘুরল। পেছনে ফিরে চাইল একবার কিশোর। বাঁকের ওপাশে অদৃশ্য হয়ে গেছে টেরর ক্যাসলের গর্বিত টাওয়ার।

সামনে অনেক নিচে উপত্যকায় লস অ্যাঞ্জেলেস শহরের আলো মিটমিট করছে। থামল না ওরা। ছুটতে ছুটতে পাথর-মাটির স্তূপের কাছে চলে এল। এখানেও থামল না। চলে এল ওপাশে। একশো গজ নিচে দাঁড়িয়ে আছে কালো রোলস-রয়েস।

গতি একটু কমাল দু'জনে। ঠিক এই সময়ই শোনা গেল তীক্ষ্ণ প্রলম্বিত একটা চিৎকার। অনেক পেছনে ক্যাসলের দিক থেকে আসছে। থেমে গেল হঠাৎ করেই। যেন দম আটকে গেছে গলায়। চমকে উঠে আবার ছোটার গতি বাড়িয়ে দিল দু'

গোয়েন্দা। এক ছুটে এসে দাঁড়াল গাড়ির কাছে।

তারার আলোয় চিকচিক করছে বিশাল রোলস-রয়েসের সোনালি হাতল। ঝটকা দিয়ে খুলে গেল এক পাশের দরজা। হাত বাড়িয়ে মুসাকে ভেতরে টেনে নিল রবিন। মুসার পরই উঠে বসল কিশোর। 'হ্যানসন!' চেঁচিয়ে উঠল সে, 'জলদি গাড়ি ছাড়ুন। বাড়ি ফিরে চলুন।'

'যাচ্ছি, মাস্টার পাশা,' শান্ত গলায় বলল হ্যানসন।

মৃদু-গুঞ্জন তুলে স্টার্ট হয়ে গেল ইঞ্জিন। প্রায় নিঃশব্দে পাহাড়ী পথ ধরে ছুটল গাড়ি। যতই নামছে, গতি বাড়ছে ততই। আরও বেশি, আরও।

'কি হয়েছিল?' সিটে এলিয়ে পড়া দুই বন্ধুকে জিজ্ঞেস করল রবিন। 'ওই চিৎকারটা কিসের?'

'জানি না,' বলল কিশোর।

'এবং আমি জানতে চাই না,' কিশোরের কথার পিঠে বলল মুসা। 'যদি কেউ জানেও, আমাকে বলতে মানা করব।'

'কিন্তু হয়েছিল কি?' আবার জিজ্ঞেস করল রবিন। 'নীল ভূতের দেখা পেয়েছ?'

মাথা নাড়ল কিশোর। 'কিছুই দেখিনি। তবে ভয় পাইয়ে ছেড়েছে আমাদের কিছু একটা।'

'ভুল হল,' শুধরে দিল মুসা। 'আতঙ্কিত করে ছেড়েছে।'

'তাহলে গালগল্পগুলো সব সত্যি?' হতাশ হয়েছে যেন রবিন। 'ভূতের উপদ্রব আছে দুর্গে।'

'আছে মানে!' সারা আমেরিকার যত ভূতপ্রেত, জিন, ভ্যাম্পায়ার, ওয়্যারউলফ সবকিছুর আড্ডা ওটা। হেডকোয়ার্টার!' শ্বাসপ্রশ্বাস সহজ হয়ে আসছে মুসার। 'ওই ভূতের খনিতে আর কখনও ঢুকছি না আমরা, কি বল?'

সমর্থনের আশায় নেতার দিকে চাইল মুসা।

কিশোর শুনল কি-না বোঝা গেল না। হেলান দিয়ে বসে আস্তে আস্তে চিমটি কাটছে নিচের ঠোঁটে। গভীর চিন্তায় মগ্ন।

'আর ওই দুর্গে ফিরে যাচ্ছি না আমরা, তাই না?' আবার জিজ্ঞেস করল মুসা।

কিন্তু এবারেও সাড়া নেই কিশোরের। ছুটন্ত গাড়ির জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে আছে। একনাগাড়ে চিমটি কেটে যাচ্ছে নিচের ঠোঁটে।

ইয়ার্ডে এসে পৌঁছুল গাড়ি।

ড্রাইভারকে ধন্যবাদ জানিয়ে নেমে পড়ল তিন গোয়েন্দা।

'পরেরবার বেটার লাক আশা করছি, মাস্টার পাশা,' জানালা দিয়ে গলা বাড়িয়ে বলল হ্যানসন। 'সত্যি খুব ভাল লাগছে আপনাদের সঙ্গ। বুড়ো ব্যাংকার

আর ধনী বিধবাদের কাজ করে করে বিরক্ত হয়ে পড়েছিলাম। একঘেয়েমী কাটছে।'

গাড়ি নিয়ে চলে গেল ইংরেজ শোফার।

বন্ধুদের নিয়ে জাংক-ইয়ার্ডে এসে ঢুকল কিশোর।

ইয়ার্ডের ভেতরে একধারে একটা ছোট বাংলোমত বাড়ি। তারই একটা ছোট্ট ঘরে ঘুমান চাচা-চাচী। ঘরের জানালা দিয়ে আলো আসছে। টেলিভিশন দেখছেন দু'জনে।

'রাত বেশি হয়নি,' বলল কিশোর। 'তাড়াতাড়িই ফিরেছি।'

'আরও আগে ফেরা উচিত ছিল। তাড়া খাওয়ার আগেই,' বলল মুসা। এখনও ফ্যাকাসে হয়ে আছে চেহারা।

কিশোরের চেহারাও ফ্যাকাসে। 'আমি আশা করেছিলাম চিৎকারটা রেকর্ড করবে তুমি। তাহলে আবার এখন শোনা যেত। বোঝা যেত কিসের চিৎকার।'

'তুমি আশা করেছিলে!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল মুসা। 'প্রাণ নিয়ে পালাতে দিশে পাচ্ছিলাম না, চিৎকার রেকর্ড করব!'

'আমার নির্দেশ ছিল, যে-কোন রকমের শব্দ রেকর্ড করার দায়িত্ব তোমার,' শান্ত গলায় বলল কিশোর। 'তবে পরিস্থিতি তো নিজের চোখেই দেখেছি, তোমাকে আর কি বলব!'

সহজ তিন-এর দিকে বন্ধুদের নিয়ে গেল কিশোর। হেডকোয়ার্টারে ঢোকার এটা সবচেয়ে সহজ গোপন পথ। ফ্রেমে আটকানো বিরাট একটা ওক কাঠের দরজা। গ্র্যানাইট পাথরে তৈরি ধসে পড়া একটা বাড়ি থেকে খুলে এনেছেন রাশেদ চাচা। ওটাকেই একটা দানবীয় স্টীম ইঞ্জিনের পুরানো বয়লারে এক প্রান্তে কায়দা করে বসিয়ে নেয়া হয়েছে।

লোহালক্কড়ের মাঝে একটা খোড়লে হাত ঢুকিয়ে দিল কিশোর। ভেতরে বসানো আছে একটা ছোট বাক্স, তাতে চাবি রাখা। এমন জায়গায় বাক্স, আর তার ভেতর দরজার চাবি থাকতে পারে, কল্পনাই করবে না কেউ। দরজার তালা খুলল কিশোর। টান দিয়ে খুলল পাল্লা। ঢুকে গেল বিরাট বয়লারে।

পুরো সোজা হয়ে দাঁড়ানো যায় না। মাথা সামান্য নুইয়ে বয়লারের ভেতর দিয়ে এগিয়ে চলল তিন কিশোর। শেষ মাথায় বড় গোল একটা ফুটো। ওটার ভেতরে মাথা ঢুকিয়ে দিল কিশোর। শরীরটা বের করে নিয়ে এল ট্রেলারের ভেতর। তার পেছনে একে একে ঢুকে পড়ল মুসা আর রবিন।

সুইচ টিপে আলো জ্বেলে দিল কিশোর। ডেস্কের ওপাশে সুইভেল চেয়ারে গিয়ে বসে পড়ল।

'এখন,' কথা শুরু করল কিশোর, 'দুর্গে কি কি ঘটেছে, আলোচনা করব আমরা। মুসা, কিসে ছুট লাগাতে বাধ্য করল তোমাকে?'

'কেউ বাধা করেনি,' সাফ জবাব দিল মুসা। 'আমার নিজেরই ছুটতে ইচ্ছে করছিল।'

'বুঝতে পারনি আমার প্রশ্ন। ছুটতে ইচ্ছে হল কেন তোমার? কি হয়েছিল?'

'শুরুতে কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। আস্তে আস্তে বাড়ল অস্বস্তি, ভয় ভয় করতে লাগল। তারপর হঠাৎ করেই চেপে ধরল দারুণ আতঙ্ক। এরপর আর না ছুটে উপায় আছে?'

'ঠিক,' নিচের ঠোঁটে চিমটি কেটে বলল কিশোর, 'ঠিক একই ব্যাপার ঘটেছে আমার বেলায়ও। শুরুতে অস্বস্তি তারপর ভয় ভয়। শেষে দারুণ আতঙ্ক। কিন্তু আসলে কি ঘটেছিল! প্রথম থেকে ভেবে দেখা উচিত। ইকো হল—প্রতিধ্বনি শুনে প্রথম ভয় পাওয়া। জলদস্যুর ছবি। কাছে পরখ করতে যাওয়া। তারপর ঠাণ্ডা বাতাসের স্রোত...'

'হিম শীতল বাতাসের স্রোত!' শুধরে দিল মুসা। 'ছবিটার কথা নতুন করে ভেবেছ কিছু? ওটার চোখ এত জ্যান্ত মনে হল কেন প্রথমে?'

'হয়ত নিছক কল্পনা,' বলল কিশোর। 'আসলে সত্যি সত্যি এমন কিছু দেখিনি আমরা, কিংবা শুনিনি, যাতে আতঙ্কিত হতে হয়।'

'নাই বা দেখলাম, টের তো পেয়েছি!' বলল মুসা। 'এমনিতেই পুরানো আমলের বাড়িগুলোতে ঢুকতে ভয় ভয় লাগে। আর ক্যাসলটা তো ভূতের আড্ডাখানা। তা-ও যে সে ভূত না, বাঘা বাঘা সব ব্যাটাদের বাস। মানুষ তো মানুষ, ছোটখাট ভূতেরাই ঢুকতে সাহস করবে না ওখানে! জায়গাটা দেখলেই ভয় লাগে!'

'আসল রহস্যটা হয়ত ওখানেই,' বলল কিশোর। 'আবার টেরর ক্যাসলে ঢুকব...' বাধা পেয়ে থেমে গেল। বেজে উঠেছে টেলিফোন।

অবাক হয়ে সেটটার দিকে চেয়ে আছে তিন গোয়েন্দা। মাত্র হপ্তা খানেক আগে এসেছে ওটা। টেলিফোন বুকে নাম ওঠেনি এখনও কিশোরের। অফিসের দু'চারজন, আর তারা তিনজন ছাড়া আর কেউই জানে না নাম্বারটা। তাহলে! কে করল ফোন!

আবার হল রিঙ। আবার।

'তুমিই ধর,' ফিসফিস করে কিশোরকে বলল মুসা।

হাত বাড়াল কশোর। আরেকবার রিঙ হতেই ধরল রিসিভার। তুলে কানে ঠেকাল। 'হ্যালো' বলেই নামিয়ে আনল, ধরল একটা মাইক্রোফোনের সামনে।

পুরানো মাইক্রোফোনটা জাংক-ইয়ার্ড থেকেই জোগাড় করেছে কিশোর। পুরানো একটা রেডিও থেকে খুলে নিয়েছে স্পীকার। মাইক্রোফোন আর স্পীকারের কানেকশন করে নিয়েছে। টেলিফোন এলে, তিনজনে একই সঙ্গে শোনার জন্যে এই ব্যবস্থা।

কথা নেই, শুধু অদ্ভুত একটা গুঞ্জন স্পীকারে।

আবার রিসিভার কানে ঠেকাল কিশোর। 'হ্যালো?' নামিয়ে এনে ধরল মাইক্রোফোনের সামনে।

এবারেও শুধু গুঞ্জন। ক্রেডলে রিসিভার রেখে দিল কিশোর। 'রঙ নাম্বার-টাম্বার কিছু একটা হয়েছে। হ্যাঁ, যা বলেছিলাম। টেরর ক্যাসলে...'

আবার বেজে উঠল টেলিফোন।

স্থির চোখে এক মুহূর্ত সেটটার দিকে চেয়ে রইল কিশোর। ছোঁ মেরে তুলে নিল রিসিভার।

'হা হ্যালো?' নামিয়ে আনল মাইক্রোফোনের সামনে।

আবার গুঞ্জন স্পীকারে। না, আগের মত নয়। একটু যেন পরিবর্তন হয়েছে। বহুদূর থেকে আসছে যেন শব্দটা, কাছিয়ে আসছে ধীরে ধীরে। হঠাৎই গুঞ্জনের ভেতর থেকে ভেসে এল বিদঘুটে একটা ঘড়ঘড়ানি, গলার কাছে পানি নিয়ে কুলি করছে যেন কেউ। তারপর অনেক কষ্টে যেন একটা শব্দ উচ্চারিত হল, 'দূরে...' থেমে গেল কথা। শাঁই শাঁই ঝড় বইছে যেন স্পীকারে। আবার উচ্চারিত হল দুটো শব্দ, 'দূরে...থাকবে...' থেমে গেল কথা। হঠাৎ গলা টিপে ধরে থামিয়ে দেয়া হয়েছে যেন।

ধীরে ধীরে কমে এল শাঁই শাঁই, দূর থেকে দূরে মিলিয়ে গেল গুঞ্জন।

'কি থেকে দূরে থাকব?' রিসিভারের দিকে চেয়ে ওটাকেই যেন প্রশ্ন করল কিশোর। তারপর আস্তে করে নামিয়ে রাখল ক্রেডলে।

দীর্ঘ এক মুহূর্ত কেউ কোন কথা বলল না। তারপর হঠাৎ করেই উঠে দাঁড়াল মুসা। বাড়ি যেতে হচ্ছে আমাকে। এই মাত্র মনে পড়ল, জরুরি একটা কাজ ফেলে এসেছি।'

'আমি যাব,' রবিনও উঠল। 'আমিও যাব তোমার সঙ্গে।'

'আমারও যাওয়া দরকার। মেরিচাচী হয়ত ভাবছেন,' উঠে দাঁড়াল কিশোরও।

হুড়োহুড়ি ঠেলাঠেলি করে বেরুতে গিয়ে একে অন্যের গায়ে ধাক্কা খেল ওরা। কে কার আগে বেরোবে সেই চেষ্টায় ব্যস্ত।

বাক্য পুরো করতে পারেনি অদ্ভুত গলাটা। কিন্তু বুঝতে একটুও অসুবিধে হল না ছেলেদের, আসলে কি বলতে চেয়েছে ওটা।

বলতে চেয়েছে:- টেরর ক্যাসল থেকে দূরে থাকার!

সাত

'সত্যিই, একটা সমস্যায়ই পড়া গেল!' বলল কিশোর।

পরদিন বিকেলে হেডকোয়ার্টারে বসে আছে দুই গোয়েন্দা। কিশোর বসে

আছে তার সুইভেল চেয়ারে। পোড়া ডেস্কের এপাশে বসেছে মুসা। রবিন গেছে লাইব্রেরিতে।

'সমস্যা আসলে দুটো,' আবার বলল গোয়েন্দাপ্রধান।

'বলছি, কি করে সমাধান করবে সমস্যার?' বলল মুসা! 'খুব সহজ। রিসিভার তুলে ফোন কর মিস্টার ক্রিস্টোফারকে। বলে দাও, তাঁর জন্যে ভূতুড়ে বাড়ি খুঁজে বের করতে পারব না আমরা। জানাও, একটার কাছে গিয়েছিলাম কোনমতে প্রাণ বাঁচিয়ে ফিরেছি। আর একবার ওটার কাছে ঘেঁষতে চাই না।'

মুসার পরামর্শের ধার দিয়েও গেল না কিশোর। 'আমাদের প্রথম সমস্যা,' বলল সে। 'জানা, কে ফোন করেছিল গতরাতে।'

'কে নয়,' শুধরে দিল মুসা। 'বল কিসে। ভূত, প্রেতাত্মা, ওয়্যারউলফ, ভ্যাম্পায়ার!'

ওদের কেউই টেলিফোন ব্যবহার করতে জানে না,' মনে করিয়ে দিল কিশোর।

'সে-তো পুরানো আমলের কথা। আমরা আধুনিক হয়েছি, ভূতেদেরও আধুনিক হতে দোষ কি? গতরাতে যে-ই ফোন করে থাকুক, গলাটা মোটেই মানুষের মত মনে হয়নি আমার।'

চিন্তিত দেখাল গোয়েন্দাপ্রধানকে। 'ঠিকই বলছ। আমরা তিনজন আর হ্যানসন ছাড়া কোন মানুষের জানার কথা না, গতরাতে টেরর ক্যাসলে গিয়েছিলাম!'

'প্রেতাত্মাদের জানতে বাধা কোথায়?' প্রশ্ন রাখল মুসা।

'তা নেই,' অনিচ্ছা সত্ত্বেও সায় দিল কিশোর। তবে, দুর্গটা সত্যিই ভূতুড়ে কিনা দেখে ছাড়ব। জন ফিলবির ব্যাপারে আরও অনেক বেশি জানতে হবে আমাদের। টেরর ক্যাসলে কারও প্রেতাত্মা থেকে থাকলে, ওরই আছে।'

'হ্যাঁ, এটা একটা কথার মত কথা বলেছ,' খুশি হয়ে বলল মুসা। 'এবার বল দ্বিতীয় সমস্যাটা কি?'

'এমন কাউকে খুঁজে বের করা, যে জন ফিলবির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশেছে।'

'কিন্তু সে-তো অনেক বছর আগের কথা! তেমন কাকে পাব আমরা?'

'অনেক আর কত? আত্মহত্যা না করলে এখনও বেঁচে থাকতে পারত জন ফিলবি। তার সঙ্গী-সাথীদের অনেকেই নিশ্চয় বেঁচে আছে এখনও। হলিউডে খোঁজ করলে তেমন কাউকে না কাউকে পেয়ে যাবই আমরা।'

'তা হয়ত পেয়ে যাব।'

'আমার মনে হয়, ফিলবির ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি বলতে পারবে তার ম্যানেজার, মিস্টার ফিসফিস।'

'মিস্টার ফিসফিস!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল মুসা। 'এটা আবার কেমন নাম?'

'ডাক নাম। লোকে ওই নামেই ডাকত। আসল নাম হ্যারি প্রাইস। এই যে, ওর ছবি।'

একটা কাগজ সহকারীর দিকে ঠেলে দিল গোয়েন্দাপ্রধান। একটা ছবি, তার নিচে কিছু লেখা। পুরানো একটা খবরের কাগজ থেকে ফটোকপি করে এনেছে রবিন। ছবিতে দু'জন লোক। একজন লম্বা, হালকা-পাতলা, পুরো মাথায় টাক। হাত মেলাচ্ছে তার চেয়ে সামান্য বেঁটে একটা লোকের সঙ্গে। মাথায় ঘন চুল। হাসিখুশি সুন্দর চেহারা। টাকমাথা লোকটার চোখ দেখলেই ভয় লাগে, গলায় একটা গভীর কাটা দাগ।

'ইয়াল্লা!' বিস্মিত মুসা। 'এই জন ফিলবির আসল চেহারা! খামোকাই ছদ্মবেশে অভিনয় করেছে। আসল চেহারা দেখালেই ভয় বেশি পেত লোকে! এই চোখ আর গলার কাটা কলজে কাঁপিয়ে দেয়।'

'ভুল করছ। ও নয়, জন ফিলবি হল অন্য লোকটা। চেহারা সুন্দর, হাসিটাও আন্তরিক।

'খাইছে!' আরও বিস্মিত হল মুসা। 'ওই লোকটা ফিলবি। ভূত-প্রেত আর দানবের অভিনয় করত! এত সুন্দর মানুষটা!'

'হ্যাঁ। ব্যক্তিগত জীবনে নাকি খুবই লাজুক লোক ছিল ফিলবি। তাছাড়া তোতলাতো। বন্ধু-বান্ধব ছিল না বললেই চলে। কি করে জানি ফিসফিসের সঙ্গে ভাব হয়ে গিয়েছিল, শেষে ম্যানেজার নিযুক্ত করে ফেলল। লোকে আগে ঠকাত ফিলবিকে। ফিসফিস ম্যানেজার হওয়ার পর আর পারেনি।'

'স্বাভাবিক!' মন্তব্য করল মুসা। 'সামনে না করে কার বাপের সাধ্য। করলেই তো ছুরি বের করবে।'

'ওকে খুঁজে পেলে কাজ হত। অনেক কিছু জানতে পারতাম ফিলবির ব্যাপারে।'

'কি করে ওর খোঁজ পাওয়া যাবে, কিছু ভেবেছ?'

'টেলিফোন গাইড।'

গাইডের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল দুই গোয়েন্দা। শেষ অবধি নামটা খুঁজে পেল মুসা।

'এই যে!' চেঁচিয়ে উঠল মুসা। 'হ্যারি প্রাইস। আটশো বারো উইলিং ভ্যালি রোড। ফোন করবে ওকে?'

'না, লোক জানাজানি হয়ে যেতে পারে। ওর সঙ্গে দেখা করব আমরা,' টেলিফোনের দিকে হাত বাড়াল কিশোর। গাড়ি দরকার।

'গাড়িটা পাওয়ায় খুব উপকার হয়েছে!' কিশোরের দিকে চেয়ে বলল মুসা, 'আচ্ছা, তিরিশ দিন শেষ হয়ে গেলে কি করব, বল তো?'

'সে তখন দেখা যাবে। বুদ্ধি একটা ভেবে রেখেছি···হ্যালো।···কিশোর

পাশা।...গাড়িটা চাই, এখুনি।' রিসিভার নামিয়ে রাখল কিশোর। 'চল, উঠি। চাচীকে বলতে হবে, রাতে দেরি করে খাব।'

বুঝিয়েসুঝিয়ে রাজি করাতে পারল বটে কিশোর, কিন্তু সন্দেহ গেল না মেরিচাচীর। গাড়ি এসে গেছে। রাজকীয় রোলস রয়েসের দিকে চেয়ে চিন্তিত ভঙ্গিতে এদিক ওদিক মাথা নাড়লেন তিনি। 'এর পর কি করবি কিশোর, তুইই জানিস! এই বয়েসেই রোলস রয়েস...! তা-ও আবার আরব শেখের ফরমাশ দেয়া! নষ্ট হয়ে যাবি তো!'

আবার যদি মত পাল্টে ফেলে মেরিচাচী, এই ভয়ে কিশোর তাড়াতাড়ি গিয়ে উঠে পড়ল গাড়িতে। মুসা উঠে বসতেই দ্রুত ইয়ার্ড থেকে বেরিয়ে যাবার নির্দেশ দিল হ্যানসনকে।

কোথায় যেতে হবে শোফারকে জানাল কিশোর।

ম্যাপ বের করে দেখে নিল হ্যানসন উইণ্ডিং ভ্যালিটি কোথায়। রকি বীচ থেকে বেশ দূরে একটা পর্বতমালার ধারে উপত্যকাটা। নিঃশব্দে ছুটে চলল রোলস রয়েস।

পাহাড়ী পথ ধরে উঠে যাচ্ছে গাড়ি। সেদিকে চেয়ে বলল কিশোর, 'হ্যানসন, ব্ল্যাক ক্যানিয়নের দিকে যাচ্ছি কেন?'

'ওদিক দিয়েই যেতে হবে, মাস্টার পাশা। ক্যানিয়নের মাইলখানেক দূর দিয়ে বেরিয়ে যাব।'

'ভালই হল। আবার একবার ঢুকব ব্ল্যাক ক্যানিয়নে। কয়েকটা ব্যাপারে শিওর হওয়া দরকার।'

মিনিট কয়েক পরেই গিরিপথের প্রবেশমুখে পৌঁছে গেল ওরা। ভেতরে ঢুকে পড়ল গাড়ি। পরিচিত পথ, অথচ কেমন অপরিচিত মনে হচ্ছে এখন! দিনের আলোয় একেবারে অন্যরকম লাগছে পথটাকে।

ভেঙে পড়া ক্রসবার আর পাথরের স্তূপের কাছে এনে গাড়ি রাখল হ্যানসন। পথের দিকে চেয়ে বলে উঠল, 'দেখুন দেখুন, আরেকটা গাড়ির টায়ারের দাগ! গতরাতেই ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছি। কেউ অনুসরণ করেছিল আমাদেরকে।'

'অনুসরণ! কে?' একে অন্যের দিকে চাইল মুসা আর কিশোর।

'আরেক রহস্য মাথা চাড়া দিচ্ছে,' বলল কিশোর। 'যাকগে। আগের কাজ আগে শেষ করি। টেরর ক্যাসলের বাইরেটা ঘুরে দেখব চল।'

'চল,' বলল দ্বিতীয় গোয়েন্দা। 'বাইরে দিয়ে ঘুরতে আমার কোন আপত্তি নেই।'

দিনের আলোয় অনেক সহজে অনেক কম সময়ে দুর্গের কাছে পৌঁছে গেল ওরা। বিশাল টাওয়ার, আকাশ ছুঁতে চাইছে যেন।

'গতরাতে ওই ভূতের আড্ডায় ঢুকেছিলাম, ভাবলে এখনও গা ছমছম করে,'

বলল মুসা।

দুর্গের বাইরের দিকে পুরো একপাক ঘুরে এল কিশোর। তারপর আবার চলল পেছনে। ওখান থেকে প্রায় খাড়া নিচে নেমে গেছে পাহাড়টা।

'বাড়িটাতে মানুষ থাকে কিনা বুঝতে চাইছি,' বলল কিশোর। তাহলে তার কিছু না কিছু চিহ্ন থাকবেই। জুতোর ছাপ...সিগারেটের পোড়া টুকরো...'

পাওয়া গেল না তেমন কিছু। পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ল দু'জনেই। দুর্গের পাশে বিশ্রাম করতে বসল।

'নাহ্, মানুষ থাকে না এখানে,' বলল কিশোর। 'ভূত আছে, তা-ও বিশ্বাস করতে পারছি না...'

হঠাৎ তীক্ষ্ণ এক চিৎকারে চমকে উঠল দু'জনেই। মানুষ! মানুষের গলা! লাফিয়ে উঠে ছুটল ওরা। কয়েক পা এগিয়েই দাঁড়িয়ে পড়ল। দুর্গের সদর দরজা দিয়ে ছুটে বেরিয়ে যাচ্ছে দুটো মানুষ। আতঙ্কিত গলায় চেঁচাচ্ছে। হঠাৎ কিসে হোঁচট লেগে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল একজন। চকচকে কিছু একটা ছিটকে পড়ল হাত থেকে। কিন্তু ওটা তুলল না সে। হাঁচড়ে-পাঁচড়ে কোনমতে উঠেই সঙ্গীর পেছনে ছুট লাগাল আবার।

'ভূত না!' বিস্ময়ের ঘোর কাটতেই বলে উঠল মুসা। 'তবে ছোটার ধরন দেখে মনে হচ্ছে ভূতের সঙ্গে দেখা হয়েছে!'

'জলদি!' বলেই ছুটতে শুরু করল কিশোর। 'ব্যাটাদের চেহারা দেখা দরকার।'

দ্রুত দৌড়াচ্ছে কিশোর। পেছনে মুসা। ✓

প্রায় চোখের আড়ালে চলে গেছে। বাঁকটা ঘুরলেই অদৃশ্য হয়ে যাবে, ধরা যাবে না ওদেরকে। বুঝে ছোটার গতি কমিয়ে দিল কিশোর। দাঁড়িয়ে পড়ল এসে, যেখানে আছাড় খেয়েছিল একজন। কাছেই পড়ে আছে চকচকে জিনিসটা। টর্চ। নিচু হয়ে তুলে নিল কিশোর। খুদে একটা নেমপ্লেট আটকানো টর্চের গায়ে। তাতে দুটো অক্ষর খোদাই করা।

'টি ডি!' জোরে জোরে পড়ল কিশোর। 'কে হতে পারে, বল তো, মুসা?'

'টেরিয়ার ডয়েল!' প্রায় ফেটে পড়ল মুসা। 'শুটকো টেরি! কিন্তু তা কি করে হয়? ব্যাটা এখানে আসবে কেন?'

'এসেছে! লাইব্রেরিতে রবিনের কাজকর্ম দেখছিল, ভুলে গেছ? আমাদের কার্ড ওই ব্যাটাই চুরি করেছে। গতরাতে ফলো করেছিল ওই। সব সময়েই তো পেছনে লেগে থাকে শুটকো। কি করি না করি জানার চেষ্টা করে। এবারেও নিশ্চয় একই ব্যাপার। আমাদের কাজে গোল বাধানর তালে আছে।'

'তা হতে পারে,' চিন্তিত দেখাচ্ছে সহকারী গোয়েন্দাকে। 'রাতে আমরা ঢুকেছি, দেখেছে! তখন সাহস করেনি। দিনের বেলা দেখতে এসেছে, কেন

গিয়েছিলাম দুর্গের ভেতরে। কেমন মজা! খেলি তো ভূতের তাড়া।' হাসি একান-ওকান হয়ে গেল মুসার।

ব্যাপারটাকে এত হালকাভাবে নিতে পারল না কিশোর। টর্চটা পকেটে ঢুকিয়ে রাখতে রাখতে বলল, 'এত হাসির কিছু নেই। ভূত আমাদেরকেও ছাড়েনি। তবে আমরা আবার ঢুকব ওদের আড্ডায়, কিন্তু শুটকো আর এদিক মাড়াবে না। ভাবছি, এখুনি আবার ঢুকব দুর্গে। দিনের আলোয় ভাল করে দেখতে চাই সব।'

প্রতিবাদ করতে গিয়েও থেমে গেল মুসা। ভারি কিছু ধসে পড়ার শব্দ কানে আসছে। চমকে চোখ তুলে চাইল দু'জনেই। ঠিক মাথার ওপরে পাহাড়ের চূড়ার কাছ থেকে গড়িয়ে নেমে আসছে বিশাল এক পাথর।

ছুট লাগাতে যাচ্ছিল মুসা, খপ করে তার হাত ধরে ফেলল কিশোর। 'থাম! আমাদের ওপর পড়বে না! কয়েক গজ দূর দিয়ে চলে যাবে।'

ঠিকই। ওদের কয়েক গজ দূর দিয়ে তুমুল গতিতে ছুটে গেল পাথরটা, দশ গজ নিচের রাস্তায় আছড়ে পড়ল। পথের সর্বনাশ করে দিয়ে, চারদিকে কংক্রীটের গুঁড়ো ছড়িয়ে ফেলে গড়িয়ে নেমে চলে গেল ঢালু পথ বেয়ে।

'ইয়াল্লা!' এখনও গা কাঁপছে মুসার। গায়ে পড়লে টেরর ক্যাসলের ভূতের সংখ্যা আরও দুটো বাড়ত!'

'দেখ দেখ!' মুসার হাত খামচে ধরে টান দিল কিশোর। 'ঢালের গায়ে ওই যে ঝোপটা, কে যেন নড়াচড়া করছে ওর ভেতরে! নিশ্চয় ব্যাটা শুটকো। অন্য ধার দিয়ে ঘুরে আমাদের অলক্ষ্যে গিয়ে চড়েছে ওখানে। পাথর গড়িয়ে দিয়েছে আমাদের দিকে।'

'এবার আর ব্যাটাকে ছাড়ছি না আমি,' শার্টের হাতা গুটাতে লাগল মুসা। 'শিক্ষা দিয়ে ছাড়ব।'

খাড়াই বেয়ে তাড়াহুড়ো করে উঠতে শুরু করল দুই গোয়েন্দা। আলগা পাথর আর ছড়িয়ে-ছিটিয়ে জন্মে থাকা কাঁটা ঝোপ বাধা সৃষ্টি করছে। খানিকটা ওঠার পরেই দেখল ওরা, দ্রুত সরে যাচ্ছে একটা/ মূর্তি, দেখতে দেখতে হারিয়ে গেল একপাশে।

আরও দ্রুত ওঠার চেষ্টা করল দু'জনে। পাহাড়ের গা থেকে কার্নিসের মত বেরিয়ে থাকা বিরাট এক চ্যাপ্টা পাথরের কাছে এসে থমকে গেল। ওটা ডিঙানো সম্ভব না। ওখানেই দাঁড়িয়ে জোরে জোরে হাঁপাতে লাগল দু'জনে।

কার্নিসের মত পাথরটার একপাশে পাহাড়ের গায়ে বড়সড় একটা চৌকোণা গুহামুখ। গুহার নিচ থেকে টেনে সামনে বেরিয়ে আছে বড় আরেকটা চ্যাপ্টা পাথর, অনেকটা ঝোলা বারান্দার মত। আরাম করে বসা যাবে ওখানে। ওটার দিকে এগিয়ে চলল দুই বন্ধু।

প্রায় পৌঁছে গেছে বারান্দার কাছে, এই সময় মাথার ওপরে চাপা গম্ভীর একটা

শব্দ হল। তারপরই পাথরে পাথরে ঠোকাঠুকির আওয়াজ। চমকে আবার চোখ তুলে চাইল দু'জনেই। এবার আর একটা নয়, অসংখ্য পাথরের ধস নেমে আসছে।

বরফের মত জমে গেল যেন মুসা। কি করবে বুঝে উঠতে পারল না।

কিন্তু বুদ্ধি হারাল না কিশোর। এক মুহূর্ত দ্বিধা করল। পরক্ষণেই সঙ্গীর হাত ধরে হ্যাঁচকা টান মারল। খোলা বারান্দার ওপর প্রায় হুমড়ি খেয়ে এসে পড়ল দু'জনে। জোরে এক ধাক্কা দিয়ে মুসাকে গুহার ভেতরে ঠেলে দিল কিশোর। নিজেও গড়িয়ে চলে এল ভেতরে। দ্রুত গড়াতে গড়াতে গর্তের একেবারে শেষ সীমায় চলে এল দু'জনে। ঠিক এই সময় প্রথম পাথরটা আঘাত হানল বারান্দায়। দেখতে দেখতে শুরু হয়ে গেল পাথরবৃষ্টি। ছোট, মাঝারি, বড়, সব রকমের, সব আকারের পাথর পড়ছে একনাগাড়ে।

বজ্রের গর্জন তুলে আছড়ে এসে বারান্দায় পড়ছে পাথর, কিছু গড়িয়ে নেমে যাচ্ছে, কিছু যাচ্ছে আটকে, কিছু গড়িয়ে চলে আসছে ভেতরে। একটার পর একটা জমছে পাথর, দেয়াল উঠে যাচ্ছে গর্তের সামনের খোলা অংশে।

গর্তের শেষ মাথায় দেয়ালের গায়ে সেঁটে বসে রইল দুই বন্ধু। আলো অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে তাদের চোখের সামনে থেকে, হারিয়ে যাচ্ছে আকাশ। কয়েক সেকেণ্ডেই পাহাড়ের ঢালে পাথরের কবরে আটকে গেল ওরা। জ্যান্ত কবর। আলো আর আকাশ পুরোপুরি অদৃশ্য হয়ে গেছে চোখের সামনে থেকে। ঘুটঘুটে অন্ধকার।

আট

বাইরে ধীরে ধীরে কমে এল পাথর। ধসের গর্জন। স্তব্ধ হয়ে গেছে দুই বন্ধু। নিকষ কালো অন্ধকার। গর্তের ভেতরে ছোট্ট পরিসর, বাতাসে ভাসছে ধূলিকণা। দম আটকে দিতে চাইছে।

'কিশোর!' কাশতে কাশতে বলল মুসা। 'ফাঁদে আটকে গেছি আমরা! আর বেরোতে পারব না! দম বন্ধ হয়ে মরব এবার!'

'নাকে রুমাল চাপা দাও, জলদি!' বলল কিশোর। 'শিগগিরই নেমে যাবে ধূলিকণা।' অন্ধকারে হাত বাড়িয়ে সঙ্গীর কাঁধ চেপে ধরল সে। 'ভেব না, দম বন্ধ হয়ে মরব না। ভূমিকম্পের ফলে সৃষ্টি হয়েছে এই গুহা। আমি দেখেছি, এক পাশের দেয়ালে বড় একটা ফাটল আছে। কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে জানি না। তবে ওটা দিয়ে বাতাস চলাচল করে। শুটকোকে ধন্যবাদ। ওর সৌজন্যেই একটা টর্চ আছে এখন আমার পকেটে।'

'ঠিকই, শুটকোকে ধন্যবাদ,' ব্যঙ্গ করল মুসা। 'ওর সৌজন্যেই এই কবরে আটকেছি আমরা! ইসস, বগাটাকে যদি হাতের কাছে পেতাম এখন। সরু ঘাড়টাই মটকে দিতাম!'

'কিন্তু ও-ই করেছে কাজটা, কোন প্রমাণ নেই। পাথরের ধস কেন নেমেছে কিছুই জানি না আমরা এখনও,' বলতে বলতেই টর্চের বোতাম টিপে দিল কিশোর। গাঢ় অন্ধকার চিরে দিল তীব্র আলোর রশ্মি।

আলো ফেলে দেখল কিশোর। ফুট ছয়েক উঁচু গুহাটা, পাশ চার ফুট মত। এক পাশের দেয়ালে ওপর থেকে নিচ পর্যন্ত নয় দশ ইঞ্চি চওড়া একটা ফাটল। ঝিরঝির করে বাতাস আসছে ওপথে। কিন্তু ওদিক দিয়ে বেরনো যাবে না।

বিরাট এক পাথর আটকে গেছে গর্তের মুখে। ওটার আশপাশে ওপরে ছোট বড় আরও পাথর ঠেসে আটকেছে, তার ওপর জমেছে বালি আর মাটি।

'হুম্‌ম্ খুব সুন্দর ভাবেই পাথরের দেয়াল উঠেছে,' যেন ভাল একটা কাজের কাজ হয়েছে এমনি ভঙ্গিতে বলল কিশোর।

'এখনও বড় বড় কথা গেল না তোমার!' মুসার গলায় ক্ষোভ। 'বলে ফেললেই হয় ভালমত আটকে গেছি আমরা। আর বেরোতে পারব না।'

'সেটা বলতে যাব কেন? এখনও জানি না বের হতে পারব কিনা। এস ঠেলা লাগাই। যদি নাড়াতে পারি...'

গায়ের জোরে ঠেলা লাগাল দু'জনে। এক চুল নড়ল না পাথর। হাঁপাতে হাঁপাতে বসে পড়ল ওরা বিশ্রাম নিতে।

'হ্যানসন নিশ্চয় আসবে।' কেঁদেই ফেলবে যেন মুসা। 'কিন্তু কিছুতেই খুঁজে পাবে না আমাদের। শেষে পুলিশে খবর দেবে। পুলিশ আসবে, বয় স্কাউটরা আসবে, খোঁজাখুঁজি হবে প্রচুর। আমরা চেঁচালেও সে আওয়াজ বাইরে যাবে না। তারমানে আর কোন দিনই...' চুপ করে গেল সে।

কিশোর শুনছে না কথা। মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে আছে। হাতের টর্চের আলোয় আলোকিত হয়ে আছে গুহার পেছন দিকটা। তীক্ষ্ণ চোখে সেদিকেই চেয়ে আছে সে।

'ছাই দেখা যাচ্ছে,' বলল কিশোর। 'কোন কারণে এখানে আশ্রয় নিয়েছিল কেউ।' বলতে বলতেই উঠে গিয়ে ছাইয়ের কাছে বসল সে। এক হাতে টর্চ নিয়ে অন্য হাতে খুঁড়তে শুরু করল ছাই আর ধুলোর গাদা। আধ ইঞ্চিমত বেরিয়েছিল, খুঁড়ে খুঁড়ে প্রায় ইঞ্চি চারেক বের করে ফেলল ওটার মাথা। একটা শক্ত ডাল। টানাহেঁচড়া করে ডালটা বের করে নিয়ে এল সে। ফুট চারেক লম্বা, ইঞ্চি দুয়েক পুরু। এক মাথা পোড়া।

'কপাল ভাল আমাদের,' বলে উঠল কিশোর। 'ডালটা পেয়ে গেছি। নিশ্চয় এর মাথায় খাবার গেঁথে পুড়িয়ে খেয়েছিল লোকটা।'

ডালটার দিকে হাবার মত চেয়ে রইল মুসা। পুরানো, আধপোড়া ওই লাঠি তাদের কি কাজে লাগবে বুঝতে পারছে না।

'এটা দিয়ে চাড় লাগিয়ে পাথর সরানর কথা ভাবছ নাকি?' জানতে চাইল

মুসা। 'খামোকাই খাটবে তাহলে।'

'না, চাড় দেব না।'

কোন কথা মনে এলে আগেভাগেই সেটা জানিয়ে দেয়ার পক্ষপাতী নয় কিশোর। আগে দেখে নেয়, তার পরিকল্পনায় খুঁত বেরোয় কিনা, তারপর দরকার হলে প্রকাশ করে। এটা জানে মুসা, তাই, ডালটা দিয়ে কি করবে না করবে সে ব্যাপারে আর কোন প্রশ্ন করল না সঙ্গীকে।

কোমরের বেল্টে ঝোলানো আটফলার ছোট সুইস ছুরিটা খুলে নিল কিশোর। একটা কাটিয়ং ব্লেড বের করে কাজে লেগে গেল।

ডালের পোড়া মাথাটা চেঁছে চোখা করে ফেলল কিশোর। ছুরিটা আবার আগের জায়গায় রেখে দিয়ে ডাল হাতে করে গিয়ে দাঁড়াল পাথরের দেয়ালের সামনে। আলো ফেলে ভালমত পরীক্ষা করে দেখল দেয়ালটা। বোঝার চেষ্টা করল কোন্ দিকে পাথরে সংখ্যা কম। তারপর লাঠির চোখা মাথা দিয়ে খোঁচা লাগাল দেয়ালের একপাশে। কয়েক ইঞ্চি ঢুকেই ঠেকে গেল লাঠির মাথা। জোরাজুরি করেও আর ঢোকানো গেল না। নিশ্চয় পাথরে আটকে গেছে। টেনে বের করে এনে আবার খানিকটা ওপরে ঢোকাল সে। আবার কয়েক ইঞ্চি ঢুকে ঠেকে গেল মাথা। আবার বের করে এনে আরেক জায়গায় ঢোকাল। এবার আর ঠেকল না। ওপাশে বেরিয়ে গেল চোখা মাথাটা। হ্যাঁচকা টানে বের করে আনতেই হড়হড় করে ঝরে পড়ল কিছু বালি মাটি।

আপন মনেই মাথা ঝোকাল কিশোর। ছিদ্রটাতে আবার লাঠি ঢোকাল। আস্তে আস্তে চাড় দিতে লাগল চারদিকে। বালি-মাটি ঝরে পড়তে লাগল। হাত ঢোকানো যায় এমন একটা গর্ত হয়ে গেল দেয়ালের গায়ে শিগগিরই। আলো চুঁইয়ে ঢুকছে গুহার ভেতর।

আবার কাজে লেগে গেল কিশোর। কয়েক মিনিটেই গর্তটার পাশে ওরকম আরেকটা গর্ত করে ফেলল। দুটো গর্তের মাঝামাঝি আবার লাঠি ঢুকিয়ে দিল। খোঁচাতে খোঁচাতে বালি-মাটি ফেলে এক করে ফেলল দুটো গর্ত। বেশ বড় একটা ফোকর হয়ে গেছে এখন। ফোকরের কাছে চোখ নিয়ে গিয়ে বাইরে তাকাল সে। চোখের সামনে ফুটে উঠল গোল একটা বড় পাথর।

'এবার,' সন্তুষ্ট গলায় বলল কিশোর, 'এস, হাত লাগাও।'

ফোকর দিয়ে লাঠি ঢুকিয়ে দিল আবার। পাথরে ঠেকাল লাঠির মাথা। দু'জনে মিলে এপাশ থেকে ঠেলা লাগাল জোরে।

প্রথমে নড়তে চাইল না পাথর! শেষ অবধি পরাজিত হতেই হল। চাপা ভোঁতা একটা আওয়াজ তুলে বালি মাটি আর সঙ্গী পাথরের আলিঙ্গন থেকে ছাড়িয়ে নিল নিজেকে, গড়িয়ে পড়তে লাগল। পড়ার সময় কিছু আলগা সঙ্গীকে নিয়ে গেল সাথে করে। ফোকরের বাইরের মুখটা বড় হল আরেকটু।

ফোকরের ওপর দিকে একটা পাথর বেছে নিল কিশোর। কতখানি বড় পাথর, ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। লাঠির মাথা পাথরের নিচের দিকে ঠেকিয়ে ঠেলে যেতে লাগল দু'জনে। এক চুল নড়ল না পাথর। পরিশ্রমে দরদর করে ঘামছে দু'জনে। পিচ্ছিল হয়ে আসছে লাঠি ধরা হাত। কিন্তু বিরত হল না। বেশিক্ষণ আর অনড় থাকতে পারল না পাথর। হড়াৎ করে একটা শব্দ তুলে খুলে এল বালিমাটির আকর্ষণ থেকে। বিশাল পাথর। ধুপ করে আছড়ে পড়ল নিচের সঙ্গী সাথীদের ওপর। অনেকগুলো পাথরকে নড়িয়ে ফেলল ধাক্কা দিয়ে, সঙ্গে নিয়ে গড়াতে গড়াতে চলে গেল ঢাল বেয়ে।

বেশ প্রশস্ত হয়ে গেছে এখন ফোকরের বাইরের দিকটা। এপাশটাও প্রশস্ত করতে লেগে গেল ওরা। খুব বেশিক্ষণ লাগল না। ক্রল করে বেরিয়ে যাবার উপযোগী একটা সুড়ঙ্গ তৈরি করে ফেলল ওরা।

'কিশোর, তুমি একটা জিনিয়াস।' প্রশংসা না করে পারল না মুসা।

'বেশি বাড়িয়ে বলছ,' প্রতিবাদ করল কিশোর। 'যা করেছি, এর জন্যে প্রতিভার দরকার পড়ে না। বাঁচার তাগিদেই মাথায় এসে গিয়েছিল বুদ্ধিটা।'

'কিন্তু আমার মাথায় তো আসেনি···'

'হয়েছে হয়েছে, বেরোও এখন। বেশি নড়াচড়া কোরো না। ওপর থেকে পাথর পড়ে থেঁতলে যেতে পারে মাথা।'

খুব সাবধানে পাঁকাল মাছের মত দেহটাকে মুচড়ে মুচড়ে গর্তের বাইরে বের করে নিয়ে এল মুসা। সামনের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে মাথা ঢোকাতে বলল বন্ধুকে।

বেশি কষ্ট করতে হল না কিশোরকে। হাত ধরে টেনে ওকে গুহার বাইরে বের করে নিয়ে এল মুসা।

ঢাল বেয়ে নিরাপদ জায়গায় সরে এল দু'জনে। নিজেদের দিকে তাকাবার সময় পেল এতক্ষণে।

'সেরেছে! চেঁচিয়ে উঠল মুসা। 'কেউ দেখলে আমাদেরকেই ভূত ঠাউরাবে এখন।'

'ও কিছু না,' বলল কিশোর। 'কোন সার্ভিস স্টেশনে থেমে হাত-মুখ ধুয়ে নিলেই হবে। ভাল করে ঝাড়লে কাপড়েও বালি থাকবে না আর তেমন। এ অবস্থায় দেখা করতে হচ্ছে না মিস্টার ফিসফিসের সঙ্গে!'

'এত কিছুর পরেও দেখা করতে যাচ্ছি আমরা!' অবাক হয়ে বন্ধুর দিকে চাইল মুসা।

'কেন নয়? ওটাই তো আসল কাজ, সেজন্যেই তো বেরিয়েছি। চল চল, দেরি হয়ে যাচ্ছে,' তাড়া দিল কিশোর।

সারা পথে পাথরের ছড়াছড়ি। হাঁটতেই কষ্ট হচ্ছে। এমনিতে যা লাগার কথা

তার দ্বিগুণ সময় লেগে গেল পথটা পেরোতে।

কাছে এসে ভয়ে ভয়ে দুর্গের সদর দরজার দিকে তাকাল মুসা।

'না, আজ আর ঢুকছি না,' বন্ধুকে অভয় দিল কিশোর। 'এমনিতেই দেরি হয়ে গেছে। মিস্টার ফিসফিসের সঙ্গে দেখা করাটা বেশি জরুরি।'

বাঁক পেরিয়ে এল দু'জনে। গাড়িটা দেখা যাচ্ছে। অস্থিরভাবে পায়চারি করছে হ্যানসন। উদ্বিগ্ন।

কিশোর আর মুসাকে দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল শোফার। 'ফিরেছেন তাহলে! খুব ভাবনায় পড়ে গিয়েছিলাম!' দু'জনের সারা গায়ে একবার চোখ বোলাল সে। 'কোন দুর্ঘটনা?'

'তেমন কিছু না,' জবাব দিল কিশোর। 'আচ্ছা, মিনিট চল্লিশেক আগে দুটো ছেলেকে এদিক দিয়ে যেতে দেখেছেন?'

'চল্লিশ মিনিট নয়, তারও বেশি আগে,' গাড়িতে উঠে বসতে বসতে বলল হ্যানসন! 'ক্যাসলের দিক থেকে ছুটে এল দুটো ছেলে। আমাকে দেখেই পাশ কেটে একটা ঝোপের ওপাশে চলে গেল। খানিক পরেই ইঞ্জিনের শব্দ শুনলাম। ঝোপের ওপাশ থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল একটা নীল স্পোর্টস কার।

একে অন্যের দিকে চাইল মুসা আর কিশোর। মাথা ঝোঁকাল দু'জনেই। টেরিয়ারের গাড়িটাও নীল রঙের স্পোর্টস কার।

'তারপর,' আগের কথার খেই ধরল হ্যানসন, 'পাথর গড়িয়ে পড়ার আওয়াজ শুনলাম। অপেক্ষায় রইলাম আপনাদের। দেরি হচ্ছে দেখে ভাবনায়ই পড়ে গিয়েছিলাম। আমার ওপর হুকুম আছে, কিছুতেই যেন গাড়িটাকে চোখের আড়াল না করি। কিন্তু আপনাদের ফিরতে আরেকটু দেরি হলেই হুকুম অমান্য করতাম, না গিয়ে পারতাম না।'

'ছেলে দুটো চলে যাবার পর পাথর গড়ানর আওয়াজ শুনেছেন? ঠিক?' নিশ্চিত হতে চাইছে কিশোর।

'নিশ্চয়,' জবাব দিল হ্যানসন। 'এখন কোথায় যাব, স্যার?'

'আটশো বারো উইডিং ভ্যালিরোড, যেখানে রওনা হয়েছিলাম,' কেমন আনমনা মনে হল কিশোরকে।

বন্ধুর মনে এখন কিসের ভাবনা চলছে, জানে মুসা। নিশ্চয় ভাবছে, পাথর ধসের আগেই যদি চলে গিয়ে থাকে টেরিয়ার, তাহলে পাথর ঠেলে ফেলল কে? পাশে বসা সঙ্গীর দিকে চাইল সে। নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে কিশোর, গভীর চিন্তায় মগ্ন।

'শুটকো নয়, তাহলে কে করল কাজটা?' আপনমনেই বিড়বিড় করল কিশোর। 'একটা মানুষকে দেখেছি পাহাড়ের ওপরে, সে-তো মিথ্যে নয়!'

'না, মিথ্যে নয়,' বন্ধুর সঙ্গে একমত হল মুসা। 'এবং ও মানুষই। ভূত-প্রেত

কিছু নয়।'

'ব্যাপারটা একটু অদ্ভুতই।' বাস্তবে ফিরে এল যেন কিশোর। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে বলল, 'হ্যানসন, একটা সার্ভিস স্টেশনে একটু রাখবেন। হাত-মুখ ধুতে হবে।'

ঝেড়েঝুড়ে জামাকাপড় যতটা সম্ভব পরিষ্কার করে নিল দুই গোয়েন্দা। হাত-মুখ ধুয়ে চুল আঁচড়ে নিল। তারপর আবার এসে উঠল গাড়িতে।

পাহাড়ী পথ ধরে আবার ছুটে চলল রোলস রয়েস। পাহাড়ের ওপাশে নিচের উপত্যকায় নেমে গেছে পথটা। ডানে মোড় নিয়ে আরও মাইল খানেক এগিয়ে গিয়ে মিশেছে উইণ্ডিং ভ্যালি রোডে।

শুরুতে পথটা বেশ চওড়া, দু'ধারে সুন্দর সুন্দর বাড়িঘর। ধীরে ধীরে সরু হয়ে গেছে, হঠাৎ করেই ঢুকে পড়েছে একটা গিরিপথে। দু'ধারে কোথাও কোথাও খাড়া পাহাড়ের দেয়াল, দু'দিক থেকে চেপে ধরতে চাইছে যেন। অনেক বেশি ঘুরেফিরে এগিয়ে গেছে পথ। হঠাৎ করেই কোন এক পাশের দেয়াল যেন লাফ দিয়ে সরে যাচ্ছে, বেরিয়ে পড়ছে খানিকটা খোলা জায়গা। ছোটখাট একআধটা বাংলোমত বাড়ি উঠেছে ওখানে। তারপরই যেন আবার লাফিয়ে পথের গা ঘেঁষে এসে দাঁড়াচ্ছে পাহাড়। এত বেশি ঘোরপ্যাঁচ বলেই পথটার নাম হয়েছে উইণ্ডিং ভ্যালি রোড।

একটা জায়গায় এসে আবার ওপরের দিকে উঠে চলল পথ, আরও সরু হয়ে আসতে লাগল। কয়েলের মত ঘুরে ঘুরে উঠে যাওয়া পথ হঠাৎ করে এসে শেষ হয়ে গেছে একজায়গায়। তারপরেই গোল একটু সমতল জায়গা পাহাড়ের মাথায়, গাড়ি ঘোরানর জন্যে। তার উল্টোদিকে খাড়া নেমে গেছে দেয়াল, তলায় গভীর খাদ। নিচে কঠিন পাথর। ঘোরানর সময় ড্রাইভার একটু অসতর্ক হলেই তলায় গিয়ে আছড়ে পড়বে গাড়ি।

গোলমত জায়গাটায় এনে গাড়ি থামিয়ে দিল হ্যানসন। জায়গা দেখে অবাকই হয়েছে যেন সে, চেহারাই জানান দিচ্ছে।

'পথের শেষ মাথায় চলে এসেছি!' এদিক ওদিক চেয়ে বলল হ্যানসন। 'কই, কোন বাড়িঘর তো চোখে পড়ছে না।'

'ওই যে, একটা মেলবক্স!' হঠাৎ বলে উঠল মুসা। বাক্সের গায়ের লেখাটা পড়ল, 'প্রাইস আটশো বারো। তার মানে কাছে পিঠেই কোথাও আছে বাড়িটা।'

গাড়ি থেকে নেমে এল দুই গোয়েন্দা। ক্ষতবিক্ষত একটা ঝোপের পাশে কাত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে মেলবক্স। ওটার ধার দিয়ে চলে গেছে একটা এবড়োখেবড়ো পাথুরে পথ। জায়গায় জায়গায় ঝোপঝাড়। ওগুলোর মাঝখান দিয়ে সোজা ওপরের দিকে উঠে গেছে পথটা। উঠে চলল দু'জনে। শিগগিরই তাদের অনেক নিচে পড়ে গেল গাড়িটা।

বেশ কয়েকটা ঝোপঝাড় পেরিয়ে এল ওরা। ছোট একটা জংলা মত জায়গা পেরোতেই চোখে পড়ল বাড়িটা। পাহাড়ের ঢালে জোর করে বসিয়ে দেয়া হয়েছে যেন লাল টালির ছাত দেয়া পুরানো টাইপের একটা স্প্যানিশ বাংলো। বাংলোর একপাশে পাহাড়ের গা ঘেঁষে দাঁড় করিয়ে দেয়া হয়েছে এক বিশাল খাঁচা, ছোটখাট ঘরের সমান। ভেতরে পুরে রাখা হয়েছে অসংখ্য কাকাতুয়া। একনাগাড়ে কিচ-কিচ করে যাচ্ছে পাখিগুলো, হুড়োহুড়ি করছে, উড়ছে খাঁচার স্বল্প পরিসরে।

খাঁচার কাছে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল দুজনে। চেয়ে আছে উজ্জ্বল রঙের পাখিগুলোর দিকে। এই সময় পেছনে শোনা গেল পায়ের আওয়াজ।

প্রায় একই সঙ্গে ঘুরে দাঁড়াল দু'জনে। যে পথে এসেছে ওরা, সেপথেই আসতে দেখল লোকটাকে। লম্বা, পুরো মাথা জুড়ে টাক, বিরাট সানগ্লাসের আড়ালে ঢাকা পড়েছে চোখ। এক কানের নিচ থেকে শুরু হয়েছে গভীর কাটা একটা দাগ, গলা বেয়ে নেমে গেছে নিচের দিকে, বুকের হাড়ের কাছে গিয়ে ঠেকেছে।

কথা বলে উঠল লোকটা। গা ছমছম করা কেমন এক ধরনের ফিসফিসে আওয়াজ। 'খবরদার, যেখানে আছ দাঁড়িয়ে থাক! একচুল নড়বে না কেউ।'

স্থির হয়ে গেল দু'জনেই।

ধীরে ধীরে এগিয়ে আসতে লাগল লোকটা। বাঁ হাতে বাগিয়ে ধরে আছে একটা মাচেটে। রোদ লেগে ঝিলিক দিয়ে উঠছে বিশাল ছুরির তীক্ষ্ণধার ফলা।

নয়

এক পা দু'পা করে এগিয়ে আসছে লোকটা।

'একটু নড়বে না!' ফিসফিসিয়ে উঠল আবার সে। "প্রাণের ভয় থাকলে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাক!'

মুসার কাছে এই হুঁশিয়ারি অহেতুক। নড়ছে না সে এমনিতেই। হঠাৎ বিদ্যুতের চমক দেখা দিল তার আর কিশোরের মাঝামাঝি। দু'জনের উরুর কাছ দিয়ে উড়ে চলে গেল মাচেটে। ঘ্যাচ করে গিয়ে বিঁধল মাটিতে।

হতাশ গলায় বলে উঠল লোকটা, 'উঁহুঁ, গেল মিস হয়ে!' সানগ্লাস খুলে আনল চোখের ওপর থেকে। নীল আন্তরিক চোখে চেয়ে আছে ছেলেদের দিকে। খানিক আগের মত ভয়াবহ আর লাগছে না এখন তাকে।

'তোমাদের পেছনে ঘাসের ভেতরে ছিল সাপটা,' সাফাই গাইল লোকটা। 'র‍্যাটলার কিনা বুঝতে পারলাম না। বেশি তাড়াহুড়ো করে ফেলেছি, সেজন্যে ফসকে গেল নিশানা।'

সাদায়-লালে মেশানো একটা রুমাল বের করে ভুরুর কাছের ঘাম মুছে

লোকটা। 'পাহাড়ের ওপাশে ঝোপঝাড় পরিষ্কার করছিলাম। বাজে জিনিস। দাবানল ছড়ানর ওস্তাদ। ইস্‌স্‌, ঘেমে নেয়ে গেছি একেবারে। এক গ্লাস করে লেমোনেড খেলে কেমন হয়, অ্যাঁ?'

লোকটার ফিসফিসানিতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে ইতিমধ্যে দুই গোয়েন্দা। মুসা আন্দাজ করল, গলার বিচ্ছিরি কাটাটাই ওই স্বর বিকৃতির জন্যে দায়ী।

বাংলোর দিকে হাঁটতে শুরু করল হ্যারি প্রাইস। পিছু পিছু চলল দুই গোয়েন্দা। একটা ঘরে এসে ঢুকল। একপাশে লম্বালম্বি পর্দা ঝোলানো। এপাশে একটা টেবিল ঘিরে কয়েকটা ইজি চেয়ার। টেবিলে বড়সড় একটা জগে বরফ দেয়া লেমোনেড। পর্দার ওপার থেকে ভেসে আসছে কাকাতুয়ার কর্কশ কিচির-মিচির।

'পাখি পুষে, পাখি বিক্রি করেই পেট চালাই আমি,' জগ থেকে তিনটে গ্লাসে লেমোনেড ঢালতে ঢালতে বলল প্রাইস। দুটো গ্লাস তুলে দিল দুই কিশোরের হাতে। 'তোমরা খাও। আমি আসছি, এক মিনিট।' সানগ্লাসটা টেবিলে নামিয়ে রেখে পাশের ঘরে চলে গেল সে।

ধীরে ধীরে লেমোনেডে চুমুক দিতে লাগল কিশোর। চিন্তিত। 'মিস্টার প্রাইসকে দেখে কি মনে হয়?'

'ভালই তো,' জবাব দিল মুসা। 'ফিসফিসানিটাই শুধু খারাপ লাগে। এমনিতে লোকটা মন্দ না।'

'হ্যাঁ, বেশ মিশুক। কিন্তু মিথ্যে কথা বলল কেন? হাত তো দেখলাম পরিষ্কার। ঝোপঝাড় কাটলে কিছু না কিছু লেগে থাকতই।'

'কিন্তু মিথ্যে কথা বলবে কেন? এর আগে কখনও দেখেনি আমাদের। কোন কারণ নেই।'

মাথা নাড়ল কিশোর। 'বুঝতে পারছি না। আরও একটা ব্যাপার। ঝোপ কাটতেই যাক আর যেখানেই যাক, বেশিক্ষণ যায়নি। লেমোনেডে বরফের টুকরো রেখে গিয়েছিল। খুব একটা গলেনি।'

'তাই তো!'

কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল কিশোর, প্রাইসকে ঢুকতে দেখে থেমে গেল।

কাপড় বদলে এসেছে প্রাইস। গায়ে স্পোর্টস শার্ট। গলায় জড়িয়ে নিয়েছে একটা স্কার্ফ।

'কাটা দাগটা দেখলে অনেকেরই অস্বস্তি লাগে,' ফিসফিস করে বলল লোকটা। 'কারও সঙ্গে কথা বলার সময় তাই স্কার্ফ জড়িয়ে নিই। অনেক বছর আগে মালয়ের এক দ্বীপে দুর্ঘটনায় পড়েছিলাম। তখন কেটেছে। সে যাকগে। তা তোমরা এখানে কি মনে করে?'

একটা কার্ড বের করে প্রাইসের দিকে বাড়িয়ে ধরল কিশোর।

হাতে নিয়ে দেখল প্রাইস। 'তিন গোয়েন্দা! বেশ বেশ! তা এখানে কি তদন্ত করতে এসেছ?'

কিশোর জানাল, জন ফিলবির ব্যাপারে কিছু আলোচনা করতে চায়।

সানগ্লাসটা তুলে নিয়ে পরল প্রাইস। 'দিনের আলো সইতে পারি না। রাতে ভাল দেখি।...তো ফিলবির ব্যাপারে হঠাৎ এত আগ্রহ কেন তোমাদের?'

'একটা আজব কথা কানে এসেছে,' বলল কিশোর। 'জন ফিলবি নাকি মরার পরে ভূত হয়ে গেছে। ঠাঁই নিয়েছে ক্যাসলেই। লোককে থাকতে দেয় না। জোর করে কেউ থাকতে চাইলে ভয় দেখিয়ে তাড়িয়ে দেয়।'

কালো কাচের ওপাশে চোখ দুটো আবছা। দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। দেখছে কিশোরকে।

'আমিও শুনেছি,' ফিসফিসিয়ে বলল লোকটা। 'ছবিতে ভূতপ্রেত দৈত্য-দানবের অভিনয় করেছে জন। ভয় পাইয়েছে দর্শককে। কিন্তু আসলে সে ছিল খুবই ভদ্র, নাজুক। খালি ফাঁকি দিত তাকে লোকে। ঠকাতো। বাধ্য হয়ে শেষে আমাকে ম্যানেজার রেখেছিল। এই যে, এই ছবিটা দেখ।'

পেছনে টেবিলে রাখা ফ্রেমে বাঁধানো ছবিটা দেখাল প্রাইস। তুলে বাড়িয়ে ধরল কিশোরের দিকে।

হাতে নিল কিশোর। মুসাও দেখল, দু'জন মানুষ দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে। হাত মেলাচ্ছে। একজন প্রাইস। আরেকজন তার চেয়ে বেঁটে, বয়েসও কম। এই ছবিটাই পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল, ফটোকপি করেছে রবিন।

ছবির তলায় লেখাঃ প্রিয় বন্ধু হ্যারিকে।—জন।

'ছবি দেখেই আন্দাজ করতে পারছ, কেমন লোক ছিল জন,' বলল প্রাইস। 'লোকের সঙ্গে তর্ক করতে পারত না সে, রাগারাগি করতে পারত না,' কানের নিচে কাটা জায়গায় একবার আঙুল ছোঁয়াল সে। 'আমাকে কেন জানি ভয় পায় লোকে। বেশি গোলমাল করে না। জনের অনুরোধে নিলাম তার ম্যানেজারি। অভিনয়ে আরও বেশি মন দিতে পারল সে। কাজটা শুধু তার পেশাই না, নেশাও ছিল। হলে বসে তার অভিনয় দেখে শিউরে উঠত দর্শক। সবাক চলচ্চিত্রের কদর বাড়ল। দেখা দিল বিপত্তি। ভীষণ চেহারার ভূতের তোতলামিতে লোকে হেসেই খুন। ভেঙে পড়ল জন। তখনকার তার মনের অবস্থা নিশ্চয় বুঝতে পারছ?'

'হ্যাঁ, স্যার,' বলল কিশোর। 'বুঝতে পারছি। আমাকে নিয়ে কেউ হাসাহাসি করলে, আমারও খুব খারাপ লাগে।'

'হপ্তার পর হপ্তা পেরিয়ে গেল,' ফিসফিসিয়ে বলে চলল লোকটা। 'ঘর থেকে বেরোয় না জন। একে একে বিদায় করে দিল চাকর-বাকরদের। কি আর করব? ওর বাজার-সদাই আমিই করে দিতে লাগলাম। চারদিক থেকে খবর আসছে তখন। ছবিটার ব্যাপারে। যেখানেই দেখানো হচ্ছে, হাসাহাসি করছে লোকে। অনেক বোঝালাম তাকে। লোকের কথায় কান দিতে মানা করলাম। কিন্তু কো

কাজ হল না,' থামল প্রাইস।

অপেক্ষা করে রইল দুই গোয়েন্দা।

'তারপর একদিন, আমাকে ডেকে, ছবিটার যে কয়টা প্রিন্ট আছে সব জোগাড় করে নিয়ে আসতে বলল জন। কেউ যেন আর না দেখতে পারে ছবিটা, কেউ যেন আর হাসাহাসি না করতে পারে। বেরোলাম। প্রচুর খরচ-খরচা করে কিনে নিয়ে এলাম সবকটা প্রিন্ট। মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা মারতেই যেন এই সময় এল ব্যাংকের সমন। অনেক টাকা ধার হয়ে গেছে। শোধ না দিতে পারলে ক্যাসলটা দখল করে নেবে ব্যাংক। টাকা-পয়সা জমাত না জন। এক হাতে আয় করত আরেক হাতে খরচ করত। ভেবেছিল, বয়েস কম, খ্যাতি হয়েছে। অনেক সময় আছে টাকা জমানর,' বলে যাচ্ছে প্রাইস। 'একদিন, ক্যাসলের মেইন রুমে বসে আছি দু'জনে। আলোচনা হচ্ছে বাড়িটা রাখতে পারবে কিনা সে ব্যাপারে। ও বলল, মরে গিয়ে হলেও বাড়িটা দখলে রাখবে সে। তার দেহ পচেগলে শেষ হয়ে যায় যাবে, কিন্তু প্রেতাত্মা বেরোবে না ক্যাসল ছেড়ে।'

চুপ করল প্রাইস। কালো কাচের ওপাশে আবছা চোখের দৃষ্টিতে নির্লিপ্ততা।

কেঁপে উঠল একবার মুসা, 'ইয়াল্লা! মরে তাহলে সত্যি সত্যিই ভূত হওয়ার ইচ্ছে ছিল ফিলবির!'

'তাই তো মনে হচ্ছে,' বলল কিশোর। 'আচ্ছা, মিস্টার প্রাইস, ফিলবি তো খুব ভদ্র ছিল। এমন একজন লোকের প্রেতাত্মাও নিশ্চয় ভদ্রই হবে। লোককে সে ভয় দেখাচ্ছে, তাড়িয়ে দিচ্ছে ক্যাসল থেকে, বিশ্বাস হতে চায় না।'

'ঠিকই,' একমত হল প্রাইস। 'আমার মনে হয় জন না, লোককে তাড়াচ্ছে অন্য প্রেতাত্মা। ওগুলো অনেক বেশি পাজী।'

'অন্য…!' ঢোক গিলল মুসা। 'বেশি পাজী!'

'হ্যাঁ। বুঝিয়ে বলছি। তোমরা জান, পাহাড়ের তলায় সাগরের ধারে পাওয়া গেছে জন ফিলবির গাড়ি?'

মাথা ঝোঁকাল দুই কিশোর।

'তাহলে এ-ও জান, একটা নোট রেখে গেছে জন। লিখে গেছে, চিরকালের জন্য অভিশপ্ত করে রেখেছে টেরর ক্যাসলকে?'

আবার মাথা ঝোঁকাল দুই গোয়েন্দা। দু'জনেই চেয়ে আছে প্রাইসের মুখের দিকে।

'পুলিশের ধারণা,' বলল প্রাইস। 'ইচ্ছে করেই পাহাড়ের ওপর থেকে গাড়ি নিয়ে পড়েছে জন। আমিও তাদের সঙ্গে একমত। সেই যে সেদিন কথা হয়েছিল ক্যাসলে, তারপর আর কোনদিন ওর সঙ্গে আমার দেখা হয়নি। আমাকে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছে জন, কোন দিন যেন আর টেরর ক্যাসলে না ঢুকি। হ্যাঁ, কোন কথা থেকে যেন…'

'অন্য প্রেতাত্মার কথা বলছিলেন,' মনে করিয়ে দিল কিশোর। 'খুব খারাপ।'

'হ্যাঁ, খারাপ প্রেতাত্মা,' বলল প্রাইস। 'সারা দুনিয়ার বিখ্যাত সব ভূতুড়ে বাড়ি থেকে মালমশলা জোগাড় করে এনে দুর্গ সাজিয়েছে জন। জাপানের এক ভূতুড়ে মন্দির থেকে এনেছে কাঠ। ভূমিকম্পে ধসে পড়েছিল ওই মন্দির। ভেতরে যে কয়জন লোক ছিল, সব মারা গিয়েছিল ইট কাঠ চাপা পড়ে। ইংল্যাণ্ডের এক ধ্বংস হয়ে যাওয়া প্রাসাদ থেকে এসেছে কিছু লোহার বরগা। ওই বরগার একটাতে দড়ি বেঁধে ফাঁসি দিয়ে আত্মহত্যা করেছিল এক সুন্দরী মেয়ে। ধসে পড়ার আগে নাকি প্রায় রাতেই মেয়েটার প্রেতাত্মা ঘুরে বেড়াতে দেখা যেত প্রাসাদের ছাতে। রাইন নদীর ধারের এক পোড়ো দুর্গের পাথর কিনে এনে লাগানো হয়েছে টেরর ক্যাসলে। ওই দুর্গের ভাঁড়ারে নাকি আটকে রাখা হয়েছিল এক পাগলা বাদককে। আটকে থেকে না খেয়ে মরে গেছে লোকটা। তারপর থেকেই গভীর রাতে দুর্গের ভেতর থেকে ভেসে আসত মিষ্টি হালকা বাজনা।'

'খাইছে!' চোখ বড় বড় হয়ে গেছে মুসার। 'দেশ-বিদেশের কুখ্যাত সব ভূতকে এনে টেরর ক্যাসলে তুলেছে জন। ওরা তো লোককে ভয় দেখিয়ে তাড়াবেই। গলা টিপে আজও মারেনি কাউকে, এটাই আশ্চর্য!'

'কেউ গিয়ে বেশি বাড়াবাড়ি করলে হয়ত মারবে,' ফিসফিসিয়ে বলল প্রাইস। 'তবে আমি যা জানি, কেউ যায় না টেরর ক্যাসলের ধারেকাছে। চোর-ডাকাত ভবঘুরেরা পর্যন্ত এড়িয়ে চলে। মাসে একবার করে ওদিক থেকে ঘুরে আসি আমি। পুরানো বন্ধুকে মনে রাখি। কোন বারই কাউকে ক্যাসলের কাছেপিঠে দেখিনি।'

ওরা ক্যাসলে গিয়েছিল, বলল না কিশোর। 'আচ্ছা, অনেক কাহিনীই তো শোনা যায় ক্যাসলের ভূত সম্পর্কে। গভীর রাতে নাকি পাইপ অর্গান বাজে, নীল ভূত দেখা যায়। কতখানি সত্যি, বলতে পারেন?'

'আমিও শুনেছি ওসব কিচ্ছা। বাজনা শুনিনি কখনও, কোন ভূতকে দেখিনি। তবে জন বলত, প্রোজেকশন রুম থেকে গভীর রাতে নাকি ভেসে এসেছে বাজনা। কয়েকবার এই ঘটনা ঘটে যাবার পর একদিন অর্গানের ইলেকট্রিক কানেকশন কেটে রাখল। বন্ধ করে রাখল প্রোজেকশন রুমের দরজা। কিন্তু লাভ হল না কিছু। সে-রাতেও ঠিক শোনা গেল সেই বাজনা।'

ঢোক গিলল মুসা।

চশমা খুলে নিল প্রাইস। দুই কিশোরের দিকে চেয়ে চোখ মিটমিট করছে। 'টেরর ক্যাসলে ভূত আছে কি নেই, জানি না আমি,' ফিসফিস করে বলল সে। 'তবে, আমাকে ঢুকতে বললে ঢুকব না। রাতে ক্যাসলের দরজার ওপাশেই যাব না। লক্ষ-কোটি টাকা দিলেও না।'

দশ

'কিশোর!' ডাক শোনা গেল মেরিচাচীর। 'এদিকে আয়। রঙগুলো বেড়ার ধার ঘেঁষে তুলে রাখবি? মুসা…রবিন, তোমরা একটু সাহায্য কর বন্ধুকে।'

কড়া রোদ। ইয়ার্ডে ব্যস্ততা। রবিনের পা ভাঙা, ভারি কাজ তার পক্ষে সম্ভব না। উল্টে রাখা পুরানো একটা বাথটাবে আরাম করে বসে রঙের হিসেব রাখছে সে। গত দু'দিন ধরেই খুব কাজ হচ্ছে ইয়ার্ডে। কবে আবার হেডকোয়ার্টারে আলোচনায় বসতে পারে তিনজন কে জানে! মিস্টার ফিসফিসের সঙ্গে দেখা করে আসার পর আর এগোয়নি তদন্ত। আসলে সময়ই পায়নি। ইয়ার্ডে ব্যস্ত থেকেছে কিশোর। মুসার বাড়িতে কি কাজ ছিল, সারতে হয়েছে। লাইব্রেরিতে রবিনেরও কাজের চাপ পড়েছিল বেশ।

গত দু'দিন খুব কম সময়ই বাড়িতে থাকতে পেরেছেন রাশেদ চাচা। বড়সড় একটা নিলাম হচ্ছে এক জায়গায়। ওখানে মাল কিনতে ব্যস্ত তিনি। ট্রাক বোঝাই হয়ে কেবলই মালের পর মাল এসে জমা হচ্ছে ইয়ার্ডে। কবে যে শেষ হবে, কে জানে!

একটানা কাজ করে গেল ওরা খুশিমনেই। মেরিচাচীর কাজ করে দিতে দ্বিধা নেই তিন গোয়েন্দার। প্রচুর চুইংগাম কিংবা টফির লোভ আছে। সঙ্গে আছে মেরিচাচীর হাতে তৈরি কেক। বয়ে বয়ে বেড়ার কাছে নিয়ে রঙ জমা করছে মুসা আর কিশোর। বাথটাবে বসে ওগুলোর হিসেব রাখছে রবিন। দুপুরের দিকে ফুরসত মিলল কিছুক্ষণের জন্য। বড় ট্রাকটা দেখা গেল ইয়ার্ডের গেটে। রাশেদ চাচা এসেছেন। ছোটখাট হালকা পাতলা মানুষ, ঈগলের মত বাঁকানো বিরাট নাকের তলায় পেল্লাই গোঁফ। ট্রাক বোঝাই মালপত্রের স্তূপের ওপর একটা পুরানো ধাঁচের চেয়ারে বসে আছেন রাজকীয় ভঙ্গিতে।

পুরানো জিনিস কিনতে গেলে, যা যা চোখে পড়ে কিছুই ফেলে আসেন না রাশেদ চাচা। কাজে লাগবে কি লাগবে না, বিক্রি হবে কিনা, ওসব নিয়ে মাথা ঘামান না। কিনে নিয়ে আসেন। পরে দেখা যাবে কি করা যায়।

ইয়ার্ডের চত্বরে এসে থামল ট্রাক। মালের দিকে একবার চেয়েই স্বামীর উদ্দেশ্যে বলে উঠলেন মেরিচাচী, 'তুমি…তুমি পাগল হয়ে গেছ! ওটা এনেছ কেন?'

পায়ে পায়ে চাচীর কাছে এসে দাঁড়িয়েছে তিন কিশোর। দাঁতের ফাঁক থেকে পাইপটা নিয়ে ওদের দিকে একবার দোলালেন রাশেদ চাচা। হাসলেন।

অবাক চোখে এক গাদা ধাতব পাইপের দিকে চেয়ে আছে তিন কিশোর। আট ফুট উঁচু একটা পাইপ অর্গান।

'অর্গানটা কিনেই ফেললাম, মেরি,' গলা খুব ভারি রাশেদ চাচার। 'বোরিস···রোভার ধর তো। নামিয়ে ফেলি। খুব সাবধানে নামাতে হবে। ভেঙে-টেঙে ফেল না আবার।'

লাফ দিয়ে মাটিতে নেমে এলেন রাশেদ চাচা। অর্গানটা নামাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল বোরিস আর রোভার।

'পাইপ অর্গান···!' কথা আটকে গেল মেরিচাচীর। 'যেশাস! পাগল হয়ে গেছে লোকটা!···অর্গান···পাইপ-অর্গান দিয়ে কি হবে!'

নাক-মুখ দিয়ে গলগল করে ধোঁয়া ছাড়লেন রাশেদ চাচা। রসিকতা করলেন, 'বাজানো শিখব। পার্ট টাইম চাকরি করা যাবে সার্কাসে।' হাসলেন তিনি। হাত লাগালেন বোরিস আর রোভারের সঙ্গে।

বোরিস আর রোভার দুই ভাই। বাভারিয়ার লোক। দু'জনেই ছয় ফুট চার ইঞ্চি লম্বা, সেই অনুপাতে চওড়া। মাথার চুল সোনালি। গায়ে মোষের জোর। সহজেই ধরে ধরে নামিয়ে আনছে ভারি পাইপগুলো।

শোবার ঘরের কাছে বেড়ার ধারে অর্গানটা বসানর সিদ্ধান্ত নিলেন রাশেদ চাচা। ওখানেই নিয়ে গাদা করে রাখা হল অর্গানের পাইপ আর অন্যান্য যন্ত্রপাতি। পরে জুড়ে দেয়া হবে।

খুব ভাল জিনিস,' তিন কিশোরকে বললেন রাশেদ চাচা। 'লস অ্যাঞ্জেলেসের পুরানো এক থিয়েটার হাউজ থেকে এনেছি।'

'খুব ভাল করেছ!' গোমরা মুখে বললেন মেরিচাচী। 'কপাল ভাল, কাছেপিঠে প্রতিবেশী নেই।' কাজ করতে চলে গেলেন তিনি।

'অনেক বড় অডিটোরিয়ামের জন্যে তৈরি হয়েছিল অর্গানটা,' ছেলেদেরকে বললেন রাশেদ চাচা। 'জোরে বাজালে কানের পর্দা ফেটে যাবে মানুষের। চাইলে খুব নিচুতে নিয়ে আসা যায় এর শব্দ। এতই নিচু, মানুষের কানেই ঢোকে না সে-আওয়াজ।'

'না-ই যদি শোনা গেল, ওটা আবার শব্দ হল নাকি?' চাচার দিকে চেয়ে বলল কিশোর।

'মানুষের কানে ঢোকে না, সার্কাসের হাতির কানে ঢুকবে,' মুচকে হাসলেন রাশেদ চাচা। চলে গেলেন সেখান থেকে।

'কান তো সবারই এক,' বলল মুসা। 'মানুষের কানে না ঢুকলে হাতির কানে ঢুকবে নাকি?'

'ঢুকতেও পারে,' জবাবটা দিল রবিন। 'কুকুরের হুইসেলের নাম শোনোনি? মানুষের কানে ঢোকে না, কিন্তু কুকুর ঠিকই শুনতে পায় ওই বাঁশির আওয়াজ।'

'সাবসোনিক,' যোগ করল কিশোর। 'বিলো সাউণ্ডও বলে একে। ভাইব্রেশন বেশি না হলে মানুষের কানে ঢোকে না শব্দ। একটা বিশেষ রেঞ্জের কাঁপন হলে

শুনেই শুনতে পায় মানুষ।'

পাইপ অর্গান আর শব্দ-রহস্য নিয়ে এতই মগ্ন ওরা, গেটের কাছে দাঁড়াল এসে নীল স্পোর্টস কারটা, খেয়ালই করল না। ড্রাইভার—টিং-টিঙে রোগাটে শরীর, লম্বা এক তরুণ। জোরে হর্ন বাজাল।

চমকে ফিরে চাইল তিন কিশোর।

তিন গোয়েন্দাকে চমকে দিতে পেরে খুব মজা পেল যেন গাড়ির আরোহীরা। জোরে হেসে উঠল ড্রাইভার আর তার দুই সঙ্গী।

'শুটকো টেরি!' লম্বা তরুণকে ড্রাইভিং সিট থেকে নেমে আসতে দেখে বলে উঠল মুসা।

'ওর এখানে কি?' বিড় বিড় করল রবিন।

বছরের একটা বিশেষ অংশ রকি বীচে কাটাতে আসে ডয়েল পরিবার, সারা বছর থাকে না। কিন্তু ওই কয়েকটা মাসই যথেষ্ট। জ্বালিয়ে মারে কিশোর, মুসা আর রবিনকে। খালি পেছনে লেগে থাকে।

নিজের বুদ্ধির ওপর অগাধ আস্থা টেরিয়ার ডয়েলের, অন্য কেউ সেটা মানল কি মানল না, তা নিয়ে মাথা ঘামায় না। নিজের গাড়ি নিজেই ড্রাইভ করে। বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়ায়। কিশোর বয়েসী ছেলেছোকরাদেরকে অধীনে রাখার চেষ্টা করে। রকি বীচের বেশির ভাগ ছেলেমেয়েই পাত্তা দেয় না তাকে, এড়িয়ে চলে। তবে বখে যাওয়া কিছু ছেলেকে দলে টানতে পেরেছে টেরিয়ার। প্রায়ই পার্টি দেয়, ওদেরকে দাওয়াত করে। তার গাড়িতে তুলে ঘোরায় সারা শহর। দরাজ হাতে খরচ করে।

এগিয়ে আসছে টেরিয়ার। হাতে একটা জুতোর বাক্স। গাড়িতে বসা দুই সঙ্গীর চোখ তার ওপর। তিন গোয়েন্দাও দেখছে তাকে। কাছাকাছি এসেই পকেটে হাত ঢোকাল সে। ঝটকা দিয়ে বের করে আনল আবার। হাতে একটা ম্যাগনিফাইং গ্লাস। রাশেদ চাচা আর দুই ব্যাভারিয়ান ভাইয়ের দিকে তাকাল। পাইপ অর্গানটা নিয়ে ব্যস্ত তারা। এখান থেকে তার কথা শুনতে পাবে না। বিশেষ কায়দায় ভুরু কুঁচকাল সে। গুরুগম্ভীর একটা ভাব ফুটিয়ে তুলল চেহারায়। ম্যাগনিফাইং গ্লাসের ভেতর দিয়ে পুরো ইয়ার্ডে চোখ বোলাল একবার। 'ভুল জায়গায় এসে পড়লাম না তো!'

টেরিয়ারের অভিনয়ে খুব মজা পেল তার দুই সঙ্গী, হেসে উঠল হো হো করে।

হাত মুঠো হয়ে গেল মুসার। এক পা সামনে বাড়াল। 'কি চাই এখানে, শুটকি?'

মুসার কথা যেন শুনতেই পেল না টেরিয়ার। ম্যাগনিফাইং গ্লাসের ভেতর দিয়ে তাকাল কিশোরের দিকে। অনেক কষ্টে যেন চিনতে পারল। গ্লাসটা আবার ভরে রাখল পকেটে। 'এই যে কিশোর হোমস, পৃথিবী বিখ্যাত গোয়েন্দা। দেখা করতে

পেরে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করছি। একটা কেস নিয়ে এসেছি আপনার কাছে, স্যার। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডও বিমূঢ় হয়ে গেছে, কোন সুরাহা করতে পারেনি কেসটা। শেষ পর্যন্ত আপনার শরণাপন্ন হতে হল। নির্দয়ভাবে খুন করা হয়েছে বেচারাকে। আশা করি এই জটিল রহস্যের সমাধান করতে পারবেন।' বাক্সটা বাড়িয়ে ধরল সে।

টেরিয়ারের বলার ভঙ্গিতে হেসে লুটোপুটি খেতে লাগল তার দুই বন্ধু।

বিশ্রি গন্ধ আসছে বাক্সের ভেতর থেকে। কি আছে, আন্দাজ করতে পারল তিন গোয়েন্দা। হাত বাড়িয়ে বাক্সটা নিল কিশোর। ডালা খোলার আগে একবার চাইল টেরিয়ারের দিকে।

হাসছে টেরিয়ার। অপেক্ষা করছে।

ডালা খুলল কিশোর। নাকে এসে যেন বাড়ি মারল পচা গন্ধ। বিরাট এক সাদা ইঁদুর, পচে ফুলে ঢোল হয়ে আছে।

'কি মনে হয়, মিস্টার হোমস?' সামান্য সামনে ঝুঁকে এল টেরিয়ার। 'ভয়াবহ এই খুনের কিনারা করতে পারবেন? আসামীকে ধরতে পারলে বড় পুরস্কার পাবেন। পঞ্চাশটা স্ট্যাম্প।'

হাসির রোল উঠেছে গাড়িতে।

আড়চোখে সেদিকে একবার চাইল কিশোর। চেহারায় কোন পরিবর্তন হল না। গম্ভীর চোখ মুখ, আস্তে করে মাথা ঝোঁকাল। গাড়িতে বসা টেরিয়ারের দুই বন্ধুকে শুনিয়ে জোরে জোরে বলল, 'আপনার মনের অবস্থা আমরা বুঝতে পারছি, মিস্টার শুটকি। খুবই দুঃখ পেয়েছেন। পাবেনই তো? হাজার হোক, নিহত জীবটা আপনার খুব প্রিয় বন্ধু ছিল।'

হঠাৎ থেমে গেল হাসির শব্দ। সতর্ক হয়ে উঠেছে গাড়িতে বসা ছেলে দুটো। চোখ মুখ লাল হয়ে উঠেছে টেরিয়ারের।

'বেচারার মৃত্যুর কারণ অনুমান করতে পারছি,' আবার বলল কিশোর। 'বদহজম। খইল খেয়েছিল এক গরু বন্ধুর সঙ্গে, একই গামলায়। গরুটার নামের আদ্যাক্ষর দুটো জানি। টি ডি। ভুরিভোজনের পরই হয়ত টেরর ক্যাসলে গিয়েছিল, ভূতের তাড়া খেয়ে প্যান্ট নষ্ট করতে করতে ফিরেছে।'

'নিজেকে খুব চালাক মনে কর, না?' হিসিয়ে উঠল টেরিয়ার।

'বিশ্বাস হচ্ছে না? দাঁড়াও, দেখাচ্ছি,' বলেই ঘুরল কিশোর। একছুটে গিয়ে ঢুকল ঘরে। কয়েক মুহূর্ত পরেই বেরিয়ে এল।

'এই যে, আদ্যাক্ষর খোদাই করা আছে এটাতে,' টর্চটা টেরিয়ারের দিকে বাড়িয়ে ধরে বলল কিশোর। 'আগে একটা এস থাকলেই তোমার পুরো নাম হয়ে যেত। শুটকি টেরিয়ার ডয়েল।'

হা হা করে হেসে উঠল মুসা। 'টর্চটা শুটকিকে দিয়েই দাও না, কিশোর।

একটা এসে বসিয়ে নেবে।'

থাবা মেরে কিশোরের হাত থেকে টর্চটা নিয়ে নিল টেরিয়ার। ঘুরে দাঁড়াল। গটমট করে হেঁটে চলে গেল গাড়ির কাছে। ড্রাইভিং সিটে উঠে বসে ফিরে চাইল। 'আহাহা, তিন গোয়েন্দা! শুনলেই হাসি পায়! শহরের ছেলেদের কারই জানতে বাকি নেই ভড়ঙের কথা। কেউ হাসি ঠেকাতে পারছে না।'

জবাবে তালে তালে হাততালি দিতে লাগল কিশোর, মুসা আর রবিন।

আরও খেপে গেল টেরিয়ার। রাগে ভাষা হারিয়ে ফেলল। ঝাল মেটাল গাড়িটার ওপর। বন বন করে ঘুরে উঠল স্টিয়ারিং। কর্কশ আর্তনাদ উঠল টায়ারের। ঘুরে গেল নীল স্পোর্টস কারের নাক। জোর এক ঝাঁকুনি খেয়েই লাফ দিল সামনে। তীব্র গতিতে ছুটে চলে গেল।

'লাইব্রেরিতে আমার কার্ড ও-ব্যাটাই চুরি করেছে,' কথা বলল রবিন। 'আমরা কাজে নেমেছি, জেনে গেছে ব্যাটা।'

'জানুক। লোককে জানাতেই তো চাই আমরা,' বলল কিশোর। 'তবে, কাজটা আরও জরুরি হয়ে পড়ল আমাদের জন্যে। প্রথম কেসে ফেল করা চলবে না কিছুতেই।'

পেছনে ফিরে চাইল একবার কিশোর। পাইপ অর্গান নিয়ে ব্যস্ত এখন রাশেদ চাচা, বোরিস আর রোভার। চাচীকে দেখা যাচ্ছে না। নিশ্চয় টেবিলে খাবার সাজাতে গেছেন।

'একটু সময় পাওয়া গেল,' বলল কিশোর। 'চল, লাঞ্চের ডাক পড়ার আগেই মীটিং শেষ করে ফেলি।'

দুই সুড়ঙ্গের দিকে এগিয়ে চলল তিন গোয়েন্দা।

তাড়াহুড়ো করে এগোতে গিয়ে অঘটন ঘটাল কিশোর। মাটিতে পড়ে থাকা একটা আলগা পাইপে পা দিয়ে বসল। গড়িয়ে চলে গেল পাইপ। তাল সামলাতে না পেরে বেকায়দা ভঙ্গিতে পড়ে গেল সে।

তাড়াতাড়ি দু'দিক থেকে গোয়েন্দা প্রধানকে তুলে বসাল রবিন আর মুসা।

প্রচণ্ড ব্যথায় দাঁতে দাঁত চেপে আছে কিশোর। 'আমার পা!...ভেঙেই গেছে বোধহয়!' গুঙিয়ে উঠল সে। 'উফ্ফ্, এই যে, এখানে!'

দেখা গেল, ইতিমধ্যেই ফুলে উঠতে শুরু করেছে ডান পায়ের গোড়ালির ওপরের গাঁট।

'ভীষণ ব্যথা!' বিকৃত হয়ে গেছে কিশোরের মুখ। 'উফ্ফ্, বোধহয় ডাক্তারই ডাকতে হবে!'

এগারো

দুই দিন পর।

বিছানায় পড়ে আছে কিশোর। সেদিন, সঙ্গে সঙ্গে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সারাদিন আটকে রাখলেন ডাক্তার। পায়ের এক্সরে করলেন। তারপর কি একটা তরল পাদার্থে পা ভিজিয়ে রাখতে দিলেন। বিকেলের দিকে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছে সে।

ডাক্তার অভয় দিয়েছেন, শিগগিরই আবার দৌড়াতে পারবে কিশোর। সারাদিন বিছানায় পড়ে না থেকে একটু একটু হাঁটাচলা করতেও বলেছেন।

ওঠার চেষ্টা করে কিশোর, পারে না। একটু নড়াচড়া করলেই প্রচণ্ড যন্ত্রণা শুরু হয়।

মনে স্বস্তি নেই গোয়েন্দা প্রধানের। দেরি হয়ে যাচ্ছে। নিশ্চয় আর অপেক্ষা করবেন না মিস্টার ডেভিস ক্রিস্টোফার। হয়ত ইতিমধ্যেই একটা ভূতুড়ে বাড়ি ঠিক করে ফেলেছেন তিনি।

কাজে নামতে না নামতেই এই অঘটন। এর চেয়ে বড় অস্বস্তিকর কারণ আর কি হতে পারে তিন গোয়েন্দার জন্যে?

কিশোরের বিছানার পাশে মলিন মুখে বসে আছে মুসা আর রবিন।

'এখনও ব্যথা করে?' জানতে চাইল মুসা।

'করে,' বলল কিশোর। 'আক্কেল হয়েছে আমার। এত অসাবধান কেন হলাম? পা-টা যে ভাঙেনি এই যথেষ্ট। যাক গে। এখন আসল কথায় আসছি। ওই টেলিফোন কল, ওটার তো কোন সুরাহা হল না। হ্যানসনের সঙ্গে আলাপ করেছি। ও জানিয়েছে, সে রাতে টেরর ক্যাসল থেকে ফেরার পথেও নাকি কে অনুসরণ করেছিল আমাদেরকে। শুটকি হতে পারে।'

'সহজেই পারে,' সায় দিল রবিন। 'ওই ব্যাটা জানে, টেরর ক্যাসলের ব্যাপারে আমরা কৌতূহলী।'

'আমার বিশ্বাস হয় না,' এদিক ওদিক মাথা নাড়ল মুসা। 'গলার স্বর এভাবে বদলে ফেলার ক্ষমতা ওই ব্যাটার নেই। অন্য কেউ করেছে। মানুষ হয়ে থাকলে, মস্তবড় অভিনেতা ওই লোক।'

'ঠিক,' বলল কিশোর। 'তবে সবই অনুমান।' একটু থেমে বলল, 'নিজের চোখে না দেখলে, ভূতে ফোন করেছে এটা মোটেই বিশ্বাস করব না আমি।'

'তা না হয় হল,' অনিশ্চিত রবিনের গলা। 'ধরে নিলাম ভূতে করেনি ফোন। কিন্তু তোমাদের ওপর পাথর ফেলল কে?'

'ঠিক,' রবিনের কথায় জোর পেল মুসা। 'পাথর ফেলল কে?'

'আপাতত ওটা নিয়ে ভাবছি না,' বলল কিশোর! 'তবে আমার ধারণা, ভূত নয়। শুটকিও না! এর পেছনে অন্য কেউ রয়েছে।'

'কে?' জানতে চাইল মুসা।

'জানলে তো বলতামই। আরও কিছু ঘটনা না ঘটলে জানা যাবে না। হ্যারি

প্রাইসের কথায় আসা যাক। কেন মিছে কথা বলল লোকটা? ঝোপ কাটছিল না, তবু কেন বলল কাটছিল? লেমোনেডের কথাই ধর। সাজিয়েই রেখেছিল টেবিলে। ফ্রিজ থেকে বরফও বের করে রেখে ছিল। যেন জানত, আমরা যাব। অবাক লাগছে না?'

কয়েক মুহূর্ত নীরবতা।

মাথা চুলকাল মুসা। বিড়বিড় করল, 'খালি প্যাঁচ। বাড়ছেই! সুরাহা হবার কোন লক্ষণই দেখছি না!'

ঠিক এই সময় ঘরে এসে ঢুকলেন মেরিচাচী। কাছে এসে দাঁড়ালেন। 'এখন কেমন লাগছে রে?'

'ভাল,' দায়সারা জবাব দিল কিশোর। তাদের আলোচনায় বাধা পড়েছে। চাইছে, মেরিচাচী চলে যাক এখন।

গেলেন না চাচী। বিছানার পাশে বসে কিশোরের আহত জায়গায় হাত রাখলেন। 'ব্যথা লাগে এখনও?'

'না।'

হেসে ফেললেন চাচী। 'আমাকে তাড়াতে চাইছিস, না?'

'না, ইয়ে···মানে···,' ধরা পড়ে গিয়ে আমতা আমতা করতে লাগল কিশোর।

'একটা কথা জানাতে এসেছি, বললেন চাচী। 'আরও আগেই বলতাম। কিন্তু ভুলে গিয়েছিলাম। ইস্‌স্, কি ভাবনায়ই না ফেলে দিয়েছিলি!' বাবা-মা হারা ছেলেটার জন্যে ভাবনার অন্ত নেই তাঁর।

'চাচী, কি বলবে, বলে ফেল না?' তাড়া দিল কিশোর।

'গতকাল সকালে এক বুড়ি এসেছিল। তুই তখন ঘুমিয়েছিলি। সে এক আজব বুড়ি!'

'আজব বুড়ি,' সতর্ক হয়ে উঠল কিশোর।

চাচীর কথায় আগ্রহী হয়ে উঠেছে মুসা আর রবিনও।

'এক জিপসি বুড়ি।'

জিপসি বুড়ি! পিঠ সোজা হয়ে গেছে মুসা আর রবিনের। কিশোরও বালিশে পিঠ রেখে আধশোয়া হল। ব্যথা ভুলে গেছে। 'তারপর?'

'দরজায় টোকা দিল বুড়ি। খুললাম। ভেতরে ডাকব কি ডাকব না ভাবছি, এই সময়ই তোর নাম বলল সে। পা মচকানর কথা বলল। ভবিষ্যদ্বাণী করলঃ সাবধান না হলে আরও বড় বিপদ হবে তোর। এর আগে কখনও দেখিনি ওকে। তোর নাম জানল কি করে, পা মচকানর খবর পেল কোথায়, ঈশ্বরই জানে!'

সাবধান হতে বলেছে! এক জিপসি বুড়ি। একে অন্যের দিকে চাইছে তিন গোয়েন্দা।

'ভেতরে ডাকলাম বুড়িকে,' আবার বললেন মেরিচাচী। 'এল। বসল। ঝোলার

ভেতর থেকে কয়েকটা তাস বের করল। বুঝলাম, তাসের ম্যাজিক জানে বুড়িটা। তাস চালাচালি করে লোকের ভবিষ্যৎ জানতে পারে। এসবে কোনদিনই বিশ্বাস নেই আমার। কিন্তু বুড়িটা যেভাবে বলল, অবিশ্বাসও করতে পারলাম না। তিনবার তাস চালল সে তোর নাম করে। তিন বারে তিনটে কথা বললঃ টি সি থেকে দূরে থাকতে হবে তোকে। পা মচকানর পেছনে টি সি রয়েছে। এরপরও যদি টি সি-কে এড়িয়ে না চলিস, আরও বিপদ হবে তোর।'

'তুমি কিছু বললে না?'

'কি আর বলব? হেসে উড়িয়ে দিয়েছি বুড়ির কথা। একটু যেন ক্ষুণ্ন হল সে। ঝোলার ভেতরে তাসগুলো ভরে উঠে চলে গেল। কিছু একটা দেখেছি ওর চোখে, খটকা লেগেছে মনে।...কিশোর, বাপ, একটু সাবধানে থাকিস তুই! কি জানি, কিছু ঘটেও যেতে পারে।' উঠলেন চাচী। 'তোরা কথা বল। আমি যাই। কাজ পড়ে আছে ওদিকে।'

বেরিয়ে গেলেন মেরি চাচী। সিঁড়িতে পায়ের শব্দ। নিচে নেমে যাচ্ছেন তিনি।

চাচী বেরিয়ে যাবার পরও অনেকক্ষণ কোন কথা বলতে পারল না তিন গোয়েন্দা। একে অন্যের দিকে চেয়ে রইল।

'টি সি...' অবশেষে কথা ফুটল রবিনের মুখে। শুকনো গলা। 'মানে, টেরর ক্যাসল।'

'শুটকির কাজও হতে পারে,' বলল কিশোর। সামান্য ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে তার চেহারা। 'সে-ই হয়ত পাঠিয়েছে বুড়িকে। কিন্তু টেরির এত বুদ্ধি, নাহ্! বিশ্বাস হচ্ছে না! মরা ইঁদুর এনে ইয়ার্কি মারা পর্যন্তই তার দৌড়।'

'কেউ...,' বলল মুসা। 'মানে, কিছু একটা চায় না, আমরা টেরর ক্যাসলে যাই। প্রথমে ফোনে হুঁশিয়ার করেছে। তারপর জিপসি বুড়ির ওপর ভর করে তাকে হাঁটিয়ে এনেছে ইয়ার্ডে। তার মুখ দিয়ে নিজে কথা বলেছে।' দুই সঙ্গীর দিকে চাইল সে। কেউ কিছু বলল না। মৌনতা সম্মতির লক্ষণ ধরে নিয়ে বলল, 'এরপর থেকে টেরর ক্যাসলের ধারেকাছে যাওয়াও আর উচিত না আমাদের। কি বল, রবিন?'

'ঠিক।'

'কিশোর?'

'ঠিক বেঠিক জানি না, তবে আবার যেতে হবে টেরর ক্যাসলে,' বলল গোয়েন্দাপ্রধান। 'লোক হাসাতে চাও? শুটকি কি বলে গেছে, মনে নেই? ভয় পেয়ে এখন পিছিয়ে গেলে থু থু দেবে সে আমাদের মুখে। সারা রকি বীচে আমাদের গোয়েন্দাগিরির খবর রটিয়ে দিয়েছে। প্রথম কেসেই ফেল করলে মুখ টিপে হাসবে সবাই আমাদের দেখলে। পিছিয়ে আসার আর উপায় নেই। এগিয়ে যেতেই হবে।'

চুপ করে রইল দুই সহকারী।

'তাছাড়া,' আবার বলল কিশোর, 'জিপসি বুড়ি এসে নতুন আরেক রহস্য যোগ করে দিয়ে গেল। বুঝতে পারছি, ঠিক পথেই এগোচ্ছি আমরা।'

'মানে?' জানতে চাইল মুসা।

'এর আগে অনেকেই ঢুকেছে টেরর ক্যাসলে। এর রহস্য ভেদ করতে চেয়েছে। কাউকেই হুঁশিয়ার করা হয়নি আমাদের মত। এর একটাই মানে। ঠিক পথেই এগোচ্ছি আমরা। টেরর ক্যাসলের আজব রহস্য ভেদ করে ফেলি, চায় না কেউ একজন।'

'বেশ, ধরে নিলাম তোমার কথাই ঠিক,' বলল মুসা। 'তাহলেও আর এগুতে পারছি না আমরা। তুমি পড়ে আছ বিছানায়। তোমার পা ভাল না হলে কাজে নামতে পারছি না আর।'

'ভুল বললে,' বলল কিশোর। 'বিছানায় শুয়ে আছি বটে, ব্রেনটা অকেজো হয়ে যায়নি, বরং ঠাণ্ডা মাথায় ভাবার সুযোগ পেয়েছি বেশি, আমি না হয় না-ই যেতে পারলাম, তোমরা যাও, আরেকবার ঘুরে এস ক্যাসল থেকে।'

'আমরা যাব!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল রবিন 'মোটেই না। টেরর ক্যাসলের ওপর বড়জোর লেখাপড়া চালিয়ে যেতে পারি আমি। তার বেশি কিছু করতে পারব না।'

'খুব বেশি কিছু করতে হবেও না তোমাদেরকে,' সহজ গলায় বলল কিশোর। 'একটা ব্যাপারে শুধু শিওর হয়ে আসতে হবে। অস্বস্তি বেড়ে আতঙ্কে রূপ নেয় কিনা জানতে হবে, আর সে আতঙ্ক কতখানি তীব্র, তাও বুঝে আসতে হবে।'

'কতখানি তীব্র!' চেঁচিয়ে উঠল মুসা। এখনও বোঝার বাকি আছে নাকি? আতঙ্কে হার্টফেল করতে বসেছিলাম গত বার, মনে নেই?'

'সেজন্যেই রবিনকে যেতে বলছি এবার সঙ্গে,' বলল কিশোর। 'ওরও একই অবস্থা হয় কিনা, জানা দরকার। আরেকটা ব্যাপার। অবস্থাটা কতক্ষণ স্থায়ী হয়, জেনে আসতে হবে। মানে, ক্যাসলের বাইরে ঠিক কতদূরে এলে পরে ওই আতঙ্ক চলে যায়, বুঝতে হবে।'

'এর আগের বারে ছিল পনেরো মাইল,' জবাব দিল মুসা। 'বাড়িতে গিয়ে নিজের বিছানায় শোয়ার পর তবে গেছে।'

'এবারে গিয়ে শিওর হয়ে নাও, সত্যিই পনেরো মাইল কিনা,' শান্ত গলা কিশোরের। 'আগের বারের মত পড়িমড়ি করে ছুটবে না। আস্তে আস্তে পিছিয়ে আসবে, ক্যাসলের বাইরে বেরোবে, পথে নামবে। খানিক পর পরই থেমে বোঝার চেষ্টা করবে, আতঙ্ক চলে গেছে কিনা।'

'আস্তে আস্তে,' শুকনো হাসি হাসল মুসা। 'আবার থামবও খানিক পর পর।'

'হয়ত আতঙ্কিতই হবে না,' বলল কিশোর। 'কারণ এবারে দিনে যাচ্ছ। দিনের আলো থাকতে থাকতেই পরীক্ষা করবে ক্যাসলের ঘরগুলো। সাহসে কুলালে

রাত নামার পরেও অপেক্ষা কোরো একটু। হ্যাঁ, আগামীকাল বিকেলেই যাচ্ছ তোমরা।'

'কি?' রবিনের দিকে চেয়ে বলল মুসা। 'যাবে তো?'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল রবিন। 'আগামীকাল হলে আমি পারছি না। লাইব্রেরিতে কাজ আছে। পরশু এবং তার পরদিনও পারব না।'

'আগামী দু'তিন দিন আমারও কাজ আছে,' বলল মুসা। 'বাড়িতে। আমিও যেতে পারছি না।'

নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে কিশোর। 'হুমম, ভাবনার কথাই। তাহলে তো প্ল্যান বদলাতেই হচ্ছে!'

'ঠিক,' খুশি হয়ে বলল মুসা। 'প্ল্যান বদলাতেই হচ্ছে।'

'বেশ,' বলল কিশোর। 'এখনও দিনের আলো থাকবে কয়েক ঘন্টা। তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়া সেরে ঘন্টাখানেকের মধ্যেই বেরিয়ে পড়। ঘুরে এস ক্যাসল থেকে।'

বারো

'ধুত্তরি।' মুখ গোমড়া মুসার। 'কখনও পারি না ওর সঙ্গে। কথার প্যাঁচে ফেলে নিয়ে ঠিক কাজ আদায় করে নেয়।'

'ঠিক,' সায় দিল রবিন। আর কিছু বলল না।

গিরিপথে এসে দাঁড়িয়েছে দু'জনে। সামনেই পাহাড়ের ঢালে টেরর ক্যাসল আকাশে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে। পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়েছে সূর্য। তেরছাভাবে রোদ এসে পড়েছে বিশাল টাওয়ারের গায়ে। পেঁচিয়ে ওঠা আঙুর-লতার ফাঁকে ফাঁকে শার্সিভাঙা জানালার ফোকর, ভয়াবহ দানবের চোখ যেন।

শিউরে উঠল একবার রবিন। 'চল, ঢুকে পড়ি। সুরুজ ডুবতে বড়জোর আর দু'ঘন্টা। তারপর ঝপাৎ করে নামবে অন্ধকার।'

ঢাল বেয়ে উঠতে শুরু করল দু'জনে। মাঝামাঝি উঠে পেছনে ফিরে চাইল একবার মুসা। বাঁকের ওপারে। পাথরের স্তূপের ওপাশে দাঁড়িয়ে আছে রোলস রয়েস। অপেক্ষা করছে হ্যানসন।

'কি মনে হয়?' উঠতে উঠতে জিজ্ঞেস করল মুসা। 'এবারেও শুঁটকি ফলো করছে আমাদের?'

'না,' এদিক ওদিক মাথা নাড়ল রবিন। পা ভাঙা। উঠতে কষ্ট হচ্ছে তার, কিন্তু মুসাকে বুঝতে দিচ্ছে না। 'আমি খেয়াল রেখেছিলাম। ওর নীল গাড়ির ছায়াও দেখিনি। কিশোরের ধারণা, টেরর ক্যাসলের ধার মাড়াবে না আর শুঁটকি।'

'আমরাও মাড়াতে চাইনি, জোর করে পাঠানো হয়েছে। তবে, শুঁটকিকে হয়ত

জোর করেও পাঠানো যাবে না।'

রবিনের কাঁধে ঝুলছে ক্যামেরা। মুসার হাতে টেপ রেকর্ডার। কোমরের বেল্টে আটকে নিয়েছে টর্চ, দু'জনেই। টেরর ক্যাসলের বারান্দায় উঠে এল ওরা। হলে ঢোকার বড় দরজাটা বন্ধ।

'তাজ্জব ব্যাপার তো!' ভুরু কুঁচকে গেছে মুসার। 'ওটকি দরজা খোলা রেখেই পালিয়েছিল, দেখেছি।'

'বাতাসে বন্ধ হয়ে গেছে হয়ত,' বলল রবিন।

হাত বাড়িয়ে দরজার নব চেপে ধরল মুসা। ঘোরাল। ঠেলা দিতেই তীক্ষ্ণ ক্যাঁ-অ্যাঁ-চ্-চ্-চ্ শব্দ করে খুলে গেল ভারি দরজা।

'মরচে পড়ে গেছে কবজায়,' মন্তব্য করল রবিন। 'ওই শব্দে ভয় পাবার কিছু নেই,' নিজেকেই যেন বোঝাল সে।

'কে বলল, ভয় পেয়েছি?' স্বীকার করতে রাজি না মুসা।

দরজা খোলা রেখেই হলে ঢুকে পড়ল ওরা। হলের এক পাশে একটা বড় ঘর। ঢুকল ওরা। পুরানো আসবাবপত্রে বোঝাই। কাঠের ভারি ভারি চেয়ার টেবিল, বিরাট ফায়ার প্লেস। রহস্যজনক কিছু দেখলেই ছবি তুলে নিতে বলে দিয়েছে কিশোর। কিন্তু তোলার মত তেমন কিছুই চোখে পড়ল না রবিনের। তবু ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ঘরের গোটা দুয়েক ছবি তুলে নিল সে।

তারপর ইকো রুমে এসে ঢুকল ওরা। ঘরে আবছা আলো আঁধারির খেলা! গা শিরশিরে একটা অনুভূতি আবহাওয়ায়, অস্বস্তিকর। বিচিত্র আর্মার সুট আর বিভিন্ন ভঙ্গিতে তোলা জন ফিলবির ছবিগুলোর দিকে চাইলে আরও বেড়ে যায় অস্বস্তি ভাবটা। একপাশে সিঁড়ি, দোতলায় উঠে গেছে। মাঝামাঝি জায়গায় একপাশের দেয়ালে কয়েকটা জানালা। কাচের শার্সি। ধুলোর পুরু আস্তরণ। ওপথেই আসছে আলো।

'মিউজিয়ম মনে হচ্ছে,' বলল রবিন। 'জানই তো, যে-কোন মিউজিয়মে ঢুকলেই কেমন জানি হয়ে যায় মন।'

'ঠিক,' সায় দিল মুসা। 'ঠিক ধরেছ। সেই অনুভূতি। মিউজিয়মে ঢুকলে এমন হয়।' কথা বলতে বলতে এগিয়ে গেল সে। 'ধুলো-বালি, পুরানো, কেমন যেন মরা মরা...।'

'মরা-অরা-অরা-অরা-অরা-অরা!'

ঘরের ঠিক মাঝামাঝি গিয়ে শেষ শব্দটা উচ্চারণ করছে মুসা, বেশ জোরে। এক লাফে পিছিয়ে এল।

'ওরে-ব্বাপরে! এত জোরান!' বলতে বলতেই ঘরের ঠিক মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াল রবিন। 'প্রতিধ্বনি।'

'ধ্বনি-অনি-অনি-অনি-অনি-অনি!'

হাত চেপে ধরে একটানে রবিনকে সরিয়ে আনল মুসা। 'ওখানে দাঁড়িয়ে জোরে কথা বললেই ওই কাণ্ড ঘটে।'

প্রতিধ্বনি পছন্দ করে রবিন। জোরে 'হাল্লো' বলার ইচ্ছেটা চাপা দিতে হল। ইকো হলের প্রতিধ্বনি মজার নয়, বরং কেমন অস্বস্তি জাগায়।

'চল, ছবিটা দেখি,' বলল রবিন। 'ওই যে, যেটা চোখ টিপেছিল তোমার দিকে চেয়ে।'

'ওই তো,' হাত তুলে দেখাল মুসা। 'জলদস্যুর সাজে জন ফিলবি।'

'চল, ভালমত দেখি,' বলল রবিন। 'একটা চেয়ারে দাঁড়িয়ে দেখ তো, নাগাল পাও কিনা।'

ভারি, পিঠবাঁকা একটা কাঠের চেয়ার ছবিটার তলায় নিয়ে এল মুসা। উঠল চেয়ারে। পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে দাঁড়িয়েও নাগাল পেল না ছবিটার।

'ওই যে একটা ব্যালকনি,' ছবিটার ওপর দিকে চেয়ে বলল রবিন। ওখান থেকে লম্বা তার দিয়ে ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছে ছবি। 'চল উঠে যাই। তার ধরে টেনে তুলে নিতে পারব ছবিটা।'

সিঁড়ির দিকে এগোনর জন্যে ঘুরে দাঁড়াতে গেল রবিন। আধপাক ঘুরেছে, এই সময় তার ক্যামেরা-কেসের চামড়ার ফিতে আটকাল কেউ। চমকে ফিরে চাইল রবিন। ঠিক তার পেছনে, আবছা অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে লম্বা এক মূর্তি। গলা চিরে বিকট চিৎকার বেরিয়ে এল তার, খিচে দৌড় মারতে চাইল দরজার দিকে।

পারল না। ফিতেয় হ্যাঁচকা টান লাগল, আবার পিছিয়ে গেল রবিন। ভারসাম্য হারাল। কাত হয়ে গেল এক পাশে। মুখ ফিরিয়ে চাইল কি আছে পেছনে। আর্মার সুট পরা এক বিরাট মূর্তি, কোপ মারার ভঙ্গিতে মাথার উপর তুলে রেখেছে তলোয়ার।

আবার চিৎকার বেরোল রবিনের গলা চিরে। পড়ে গেল মার্বেলের মেঝেতে। সঙ্গে সঙ্গে গড়ান দিয়ে সরে গেল একপাশে।

খটাং করে মেঝেতে পড়ল তলোয়ার, মুহূর্ত আগে ঠিক ওই জায়গাতেই ছিল রবিন। তলোয়ারের পাশেই পড়ল মূর্তিটা। বদ্ধ ঘরে বিকট আওয়াজ হল। ইস্পাতের খালি ড্রাম পড়ল যেন একটা।

ফিতেয় টান নেই আর এখন। গড়িয়ে দূরে সরে গেল রবিন। দেয়ালে এসে ঠেকার আগে থামল না। ফিরে চাইল। খাড়া হয়ে গেছে ঘাড়ের চুল। তার দিকে তেড়ে আসছে না আর্মার সুট পরা মূর্তি। ধড় থেকে মাথা আলাদা হয়ে গেছে ওটার। গড়াতে গড়াতে চলে যাচ্ছে মেঝের ওপর দিয়ে। থেমে গেল দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে।

আরও কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করে উঠল রবিন। পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল পড়ে থাকা ধড়টার দিকে। পাশে গিয়ে বসল ভয়ে ভয়ে। ধড়ের গলার ভেতরে

একবার উঁকি দিয়েই হাঁপ ছাড়ল। খালি। আসলে ওটা একটা আর্মার সুট। আস্ত। কায়দা করে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছিল দেয়ালে ঠেকা দিয়ে। একটা হাত ওপরের দিকে তুলে আটকে দেয়া হয়েছিল কোনভাবে। হাতের মুঠোয় ধরিয়ে দেয়া হয়েছিল তলোয়ার। খুব কাছাকাছি গিয়েছিল রবিন। বেধে গিয়েছিল ফিতে। রবিন পাশে ঘোরার সময় টান লেগেছে, পড়ে গেছে মূর্তিটা। চোট সইতে না পেরে গলা থেকে আলগা হয়ে গেছে লোহার শিরস্ত্রাণ।

চোখ বড় বড় করে সুটটার দিকে চেয়ে আছে রবিন। চমকে উঠল অট্টহাসির শব্দে। হো হো করে ঘর ফাটিয়ে হাসছে মুসা।

হাসিতে যোগ দিল না রবিন। বেকায়দা ভঙ্গিতে পড়ে থাকা সুটের ধড়ের একটা ছবি তুলল। আরেকটা ছবি তুলল মুসার।

'যাক,' বলল রবিন। 'ক্যাসলের এক ভূতের ছবি তুললাম।' চেয়ারে দাঁড়িয়ে হাসছে। 'দেখে নিশ্চয় মজা পাবে কিশোর।'

'ক্যামেরাটা আমার হাতে থাকা উচিত ছিল, রবিন,' চোখের পানি মুছতে মুছতে বলল মুসা। 'কাত হয়ে পড়ে যাচ্ছ তুমি। পেছনে তলোয়ার উঁচিয়ে আছে আর্মার সুট পরা এক মূর্তি। আহ, যা দারুণ একখান ছবি হত না!' আবার হাসতে লাগল সে।

আর্মার সুটটার দিকে একবার তাকাল রবিন। দৃষ্টি দিয়ে ওটাকে ভস্ম করার চেষ্টা চালাল যেন। ব্যর্থ হয়ে ফিরল দেয়ালে ঝোলানো ছবির দিকে। ক্যামেরা চোখের সামনে তুলে এনে শটাশট শাটার টিপে চলল একের পর এক।

কয়েকটা ছবি তুলে নিয়ে মুসার দিকে ফিরল রবিন। 'হাসি থামবে এবার? অনেক কাজ পড়ে আছে। ওই যে দরজাটা, চল ওঘরে ঢুকি।' দরজার কপালে বসানো প্লেটের লেখা পড়ল, 'প্রোজেকশন রুম।'

চেয়ার থেকে নেমে এল মুসা। বাবার মুখে শুনেছি, আগে বড় বড় অভিনেতার বাড়িতে নিজস্ব প্রোজেকশন রুম থাকত। ঘরে বসেই নিজের ছবি দেখত, বন্ধুদের দেখাত। চল দেখি ঘরটা।'

হাতল ধরে জোরে টান দিল রবিন। ধীরে ধীরে খুলে গেল পাল্লা, যেন ওপাশ থেকে টেনে ধরে রেখেছে কেউ। এক ঝলক হাওয়া এসে ঝাপটা মারল গায়ে, নাকে এসে লাগল ভ্যাপসা গন্ধ। দরজার ওপাশে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। নিরেট অন্ধকার।

বেল্টে ঝোলানো টর্চ খুলে নিল মুসা। আলো ফেলল ভেতরে।

অন্ধকারের কালো চাদর ফুঁড়ে বেরিয়ে গেল আলোক রশ্মি। চোখের সামনে ভেসে উঠল প্রোজেকশন রুম। বেশ বড় একটা হলঘর। কয়েক সারিতে রাখা হয়েছে শ'খানেক চেয়ার। একপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে বিরাট এক পাইপ অর্গান!

'মুভি-থিয়েটারের মত সাজানো হয়েছে,' বলল মুসা। 'অর্গানটা দেখেছ?

রাশেদ চাচারটার চেয়েও অনেক বড়।'

নিজের টর্চ খুলে আনল রবিন। সুইচ টিপল। আলো জ্বলল না। ভাল করে দেখে বুঝল, ভেঙে গেছে কাচ। সে যখন মেঝেতে পড়ে গিয়েছিল, বাড়ি লেগেছিল তখনই।

একটা টর্চের আলোই যথেষ্ট। প্রোজেকশন রুমের ভেতরে এসে ঢুকল দু'জনে। এগোল পাইপ অর্গানটার দিকে।

হাসাহাসি করে হালকা হয়ে গেছে মন। ভয় কেটে গেছে দু'জনেরই। অর্গানের কাছে এসে দাঁড়াল ওরা।

ছাতের কাছাকাছি উঠে গেছে বিশাল পাইপগুলো। ধুলোবালি আর মাকড়সার জাল লেগে আছে। অর্গানের একটা ছবি তুলল রবিন।

আলো ফেলে ফেলে পুরো ঘরটা দেখল ওরা। যত্নের অভাবে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে চেয়ারগুলো। জায়গায় জায়গায় উঠে গেছে ছাল-চামড়া-গদি। ছবি দেখানর পর্দার জায়গায় ঝুলছে এখন কয়েক ফালি সাদা কাপড়। গুমোট গরম ঘরে।

'এখানে কিছু নেই,' বলল মুসা। 'চল, ওপরে যাই।'

প্রোজেকশন রুম থেকে বেরিয়ে এল ওরা। ইকো হল পেরিয়ে এক প্রান্তের সিঁড়ির গোড়ায় চলে এল। উঠতে শুরু করল সিঁড়ি বেয়ে। আধপাক ঘুরে দোতলায় গিয়ে শেষ হয়েছে সিঁড়ির আরেক মাথা। মাঝামাঝি উঠে থামল ওরা। ধুলোয় ঢাকা জানালার শার্সি দিয়ে বাইরে তাকাল। চোখে পড়ছে গিরিপথ।

'আরও ঘন্টা দেড়েক আলো থাকবে,' বলল রবিন। 'এরমধ্যেই দেখে নিতে হবে যা দেখার।'

'আগে জলদস্যুর ছবিটা ভালমত দেখি, চল,' পরামর্শ দিল মুসা।

ব্যালকনিতে এসে থামল ওরা। দু'জনেই ধরল ছবির তার, টান দিল। ভীষণ ভারি ফ্রেম। দু'জনে টেনে তুলতেও বেগ পেতে হল।

উঠে এল ছবি। ওটার ওপর টর্চের আলো ফেলল মুসা। সাধারণ ছবি। তেল রঙে আঁকা, একজনেই আলো পড়লে সামান্য চকচক করে। রবিনের ধারণা হল, হয়ত বিশেষ কোন একটা দৃষ্টিকোণ থেকে ছবির চোখের দিকে চেয়েছিল মুসা, চকচক করতে দেখেছিল। জ্যান্ত চোখ বলে মনে হয়েছিল তখন। সেটা তাকে বলল রবিন।

কিন্তু সন্দেহ গেল না মুসার। জ্যান্তই মনে হয়েছিল! কি জানি, ভুলও দেখে থাকতে পারি! যাকগে, আবার নামিয়ে রাখি ছবিটা, এস।'

আবার আগের জায়গায় ছবিটা ঝুলিয়ে রাখল ওরা। সরে এল ব্যালকনি থেকে। আবার চলে এল সিঁড়িতে।

সিঁড়ি ভেঙে উঠতেই থাকল ওরা। একটু পরেই মোটা থামের মত একটা টাওয়ারের ভেতরে আবিষ্কার করল নিজেদেরকে। চারদিকে ছোট ছোট জানালা।

বাইরে তাকাল। ক্যাসলের চূড়ার কাছে উঠে এসেছে ওরা। অনেক নিচে ব্ল্যাক ক্যানিয়ন। যতদূর চোখ যায়, শুধু পাহাড় আর পাহাড়।

'আরে! দেখেছ!' হঠাৎ বলে উঠল মুসা। 'একটা এরিয়াল! টেলিভিশনের!'

চাইল রবিন। ঠিকই। ওদের একেবারে কাছের পাহাড় চূড়ায় দাঁড়িয়ে আছে একটা এরিয়াল। হয়ত পাহাড়ের ওপাশেই রয়েছে কোন বাড়ি। ভাল রিসিপশনের জন্যে এরিয়ালটা লাগিয়েছে বাড়ির লোকে!

'পাহাড়ের মাঝে মাঝে অনেক গিরিপথ রয়েছে, দেখেছ?' আঙুল তুলে একটা দিক দেখিয়ে বলল মুসা। 'ব্ল্যাক ক্যানিয়নের মত নির্জন নয় ওগুলো।'

'ডজন ডজন সরু গিরিপথ আছে এদিকে পাহাড়ের ভেতরে ভেতরে,' বলল রবিন। 'আমি ভাবছি এরিয়ালটার কথা। পাহাড়ের ঢাল কি খাড়া দেখেছ? ওতে চড়তে চাইলে…! মনে হচ্ছে, ওদিক দিয়ে ঘুরে যেতে হবে।'

'আমারও তাই ধারণা,' বলল মুসা। 'চল, নামি। এখানে আর কিছু দেখার নেই।'

খানিকটা নেমে একটা বড় ঘরে এসে ঢুকল ওরা। গাদা গাদা বই র‍্যাকে। লাইব্রেরি। এখানকার দেয়ালেও অনেক ছবি ঝোলানো, ইকো হলের ছবিগুলোর চেয়ে আকারে ছোট।

'চল, দেখি ছবিগুলো,' প্রস্তাব রাখল মুসা।

রবিন রাজি।

জন ফিলবির অভিনীত ছবির দৃশ্য। কোথাও সে জলদস্যু, কোথাও ছিনতাইকারী, ওয়্যারউলফ, জোম্বি, ভ্যাম্পায়ার, আবার কোথাও বা সাগর থেকে উঠে আসা কোন নাম-না জানা ভয়াবহ দানব।

'ইস্, ফিল্মগুলো যদি দেখতে পারতাম!' বলল মুসা। 'একই লোকের মত চেহারা!'

'লোকে এজন্যেই তাকে লক্ষমুখো ডাকত,' মনে করিয়ে দিল রবিন। 'আরে, দেখ দেখ!'

এক জায়গায় দেয়ালের একটা চারকোণা ফোকরে একটা বাক্স, মমিকেস। ডালা বন্ধ। রূপার একটা প্লেট লাগানো বাক্সের গায়ে। এগিয়ে গিয়ে প্লেটে টর্চের আলো ফেলল মুসা। খোদাই করে ইংরেজিতে লেখা রয়েছেঃ

> জন ফিলবি,
> তোমার অভিনীত ছবি দেখে অনেক মজা পেয়েছি বেঁচে
> থাকতে। মৃত্যুর পর আমার দেহের এই বিশেষ
> অংশগুলো তোমাকেই দান করে গেলাম। তোমার
> মিউজিয়মে সাজিয়ে রেখ।—পিটার হেনশ।

'সেরেছে!' চাপা গলায় বলল মুসা। 'ভেতরে কি আছে!'

'আর কি? নিশ্চয় মমি-টমি কিছু!'

'অন্য কিছুও হতে পারে! এস, দেখি!'

ডালা ধরে ওপরের দিকে টান দিল মুসা। বেজায় ভারি। তুলতে কষ্ট হচ্ছে।

ডালাটা অর্ধেক উঠে যেতেই ভেতরে চাইল মুসা। 'ওরেব্বাপরে!' বলেই ছেড়ে দিল ডালা। সরে এল এক লাফে।

'কি, কি হল?' রবিনের গলায় উৎকণ্ঠা।

'দাঁত বের করে হাসছে! কঙ্কাল! উরিব্বাপরে!'

বার দুই ঢোক গিলল রবিন। 'কঙ্কাল! নড়েচড়ে ওঠেনি তো!'

'বুঝতে পারলাম না!'

'এস তো, আবার তুলে দেখি!'

ভয়ে ভয়ে এসে আবার ডালা ধরল মুসা। রবিনও হাত লাগাল।

ডালা তুলে ভেতরে উঁকি দিল দু'জনেই। সাধারণ একটা কঙ্কাল পড়ে আছে চিত হয়ে। না, নড়ছে না। একেবারে স্থির।

'খামোকা ভয় পেয়েছ,' বলল রবিন। 'নিশ্চয় ওটা পিটার হেনশর কঙ্কাল। একটা ছবি তুলে নিই। কিশোর খুশি হবে।'

ছবি তুলে নিল রবিন। মুসা নেই ওখানে। জানালার ধারে সরে যাচ্ছে।

'সর্বনাশ!' হঠাৎ চিৎকার শোনা গেল মুসার। 'রবিন, জলদি কর! অন্ধকার...'

'তা কি করে হয়?' হাতঘড়ির দিকে চাইল রবিন! এখনও এক ঘন্টা আলো থাকার কথা!'

'কি জানি! দেখে যাও!'

জানালার ধারে সরে এল রবিন। ঠিকই, বাইরে গিরিপথে অন্ধকার নামতে শুরু করেছে। উঁচু পাহাড়ের ওপারে হারিয়ে গেছে সূর্য।

'ভুলেই গিয়েছিলাম,' রবিনের গলায় শঙ্কা, 'এসব পাহাড়ী অঞ্চলে সূর্য একটু তাড়াতাড়িই ডোবে।'

'চল, বেরিয়ে পড়ি,' তাগাদা দিল মুসা। 'অন্ধকারে এখানে এক মুহূর্ত থাকতে রাজি নই আমি।'

বারান্দায় বেরিয়ে এল ওরা। দুই প্রান্ত থেকেই সিঁড়ি নেমে গেছে। দেখতে ঠিক একই রকম। কাছের সিঁড়িটার দিকে এগিয়ে গেল ওরা। নামতে শুরু করল।

এক জায়গায় এসে শেষ হল সিঁড়ি। একটা হল-ঘরে এসে ঢুকেছে ওরা। আবছা অন্ধকার। এক নজর দেখেই বুঝল, এটা ইকো রুম নয়, অন্য ঘর। এক প্রান্ত থেকে সিঁড়ি নেমে গেছে।

'এদিক দিয়ে যাইনি আমরা,' বলল রবিন। 'চল ফিরি। ওপর তলায় উঠে অন্য সিঁড়ি দিয়ে নামব।'

'কি দরকার?' বাধা দিল মুসা। 'ওই তো সিঁড়ি নেমে গেছে। নিশ্চয় নিচের

তলায়ই নেমেছে।'

অপ্রশস্ত সিঁড়ি। গায়ে গায়ে ঠেকে যায়। দ্রুত নেমে চলল দু'জনে। কয়েক ধাপ নেমেই সরু ছোট একটা প্যাসেজে শেষ হয়েছে সিঁড়ি। প্যাসেজের দু'পাশে দেয়াল। ও মাথায় দরজা।

তাড়াতাড়ি দরজার কাছে চলে এল ওরা। ঘন হয়ে আসছে অন্ধকার। নব ঘুরিয়ে ঠেলা দিতেই দরজা খুলে গেল! ওপাশ থেকে আবার সিঁড়ি নেমেছে। মুসা চলে গেল ওপাশে। ছেড়ে দিতেই বন্ধ হয়ে যেতে চাইল স্প্রিং লাগানো পাল্লা। খপ করে আবার ধরে ফেলল সে। রবিনও চলে এল এপাশে। পাল্লা ছেড়ে দিল মুসা।

দরজা বন্ধ হয়ে যেতেই গাঢ় অন্ধকার গ্রাস করল ওদেরকে।

'চল ফিরে যাই,' আবার বলল রবিন। 'এই অন্ধকারে অচেনা পথে চলতে মন সায় দিচ্ছে না।'

'ঠিকই বলেছ! এখন আমারও কেমন কেমন লাগছে!' ফিরে যাবার জন্যে ঘুরে দাঁড়াল মুসা। দরজার নব ধরে মোচড় দিল। অন্ধকারে তার শঙ্কিত গলা শোনা গেল। 'ইয়াল্লা! রবিন, নব ঘুরছে না! অটোমেটিক লক! পুশ বাটন ওপাশে। তাড়াহুড়োয় চাপ লেগে গেছে হয়ত!'

'তাহলে আর কি করা!' গলা স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করল রবিন। 'না চাইলেও সামনেই বাড়তে হবে আমাদের!'

'কিছুই দেখা যাচ্ছে না! দেখি, টর্চ জ্বালি!...আরে, টর্চ কোথায় গেল আমার!...কোথায়!...নিশ্চয়, মমিকেসের ডালা তোলার সময় নামিয়ে রেখেছিলাম!'

'খুব ভাল করেছ! আমার টর্চটাও নষ্ট! এখন? কি উপায়?'

'কাচ ভেঙেছে, বালব তো ভাঙেনি। দেখি, টর্চটা দাও আমার হাতে,' অন্ধকারে রবিনের বাহুতে হাত রাখল মুসা।

সঙ্গীর হাতে টর্চ তুলে দিল রবিন।

টর্চের গায়ে বার দুই থাবা লাগাল মুসা। জোরে জোরে ঝাঁকুনি দিল বার কয়েক। সুইচ টিপল। জ্বলে উঠল বালব। নিভে গেল। আবার ঝাঁকুনি দিতেই আবার জ্বলল, মিটমিট করে। ম্লান আলো।

'ঠিকমত ব্যাটারি কানেকশন পাচ্ছে না,' মন্তব্য করল মুসা। 'তবে কাজ চালানো যাবে। এস, নামি।'

ঘুরে ঘুরে নেমে গেছে সরু সিঁড়ি। আগে নেমে চলল মুসা। তাকে অনুসরণ করল রবিন। শেষ হল সিঁড়ি। ম্লান আলোয় দেখল, ছোট একটা ঘরে এসে দাঁড়িয়েছে ওরা। দু'দিকে দুটো দরজা। বেরোবে কোন্ দরজা দিয়ে?

সিদ্ধান্ত নিয়ে একটা দরজার দিকে পা বাড়াল রবিন। সঙ্গে সঙ্গে তার বাহু খামচে ধরল মুসা। 'শুনছ! শুনতে পাচ্ছ!'

কান পাতল রবিন। সে-ও শুনতে পেল।

বাজনা। মৃদু, কাঁপা কাঁপা, বহুদূর থেকে আসছে যেন। প্রোজেকশন রুমের ভাঙা অর্গান পাইপ বাজছে! অস্বস্তি বোধ করতে লাগল রবিন। হঠাৎ করেই।

'ওদিক থেকে আসছে,' আঙুল তুলে একটা দরজা দেখিয়ে বলল মুসা।

'তাহলে চল ওদিকে যাই,' উল্টো দিকের আরেকটা দরজা দেখাল রবিন।

'না, ওটা দিয়েই যাওয়া উচিত,' আগের দরজাটা আবার দেখাল মুসা। 'নিশ্চয় প্রোজেকশন রুমে ঢুকব গিয়ে। ঘরটা চেনা। অচেনা কোন ঘরে ঢুকতে আর রাজি নই আমি। এখন তো নয়ই।'

দরজা খুলল মুসা। অন্ধকার একটা ঘরে ঢুকল দু'জনে। ম্লান আলোয় পথ দেখে এগিয়ে চলল। বাড়ছে বাজনার শব্দ। এখনও অনেক দূরে মনে হচ্ছে। তীক্ষ্ণ ক্যাঁচকোঁচ আর চাপা চিৎকার কেমন ভুতুড়ে করে তুলেছে অর্গানের বাজনাকে!

এগিয়ে চলেছে দু'জনে। সামনে মুসা। তার ঠিক পেছনেই রবিন। যতই এগোচ্ছে, বাড়ছে অস্বস্তি-বোধ।

হলের শেষ প্রান্তে এসে দাঁড়াল ওরা। একটা দরজা। ঠেলে দিল মুসা। খুলে গেল পাল্লা। প্রোজেকশন রুমে ঢুকল দু'জনে।

সামনেই পড়ে আছে সারি সারি চেয়ার। ম্লান আলোয় সামনের কয়েকটা চেয়ার দেখা যাচ্ছে আবছাভাবে। অর্গান পাইপটা রয়েছে অন্য প্রান্তে। অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে না। যেদিক থেকে বাজনার শব্দ আসছে, সেদিকে তাকাল মুসা। খপ করে চেপে ধরল রবিনের একটা হাত।

রবিনও তাকাল। স্থির হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। মেঝের ফুট চারেক উঁচুতে বাতাসে ঝুলে আছে অদ্ভুত নীল আলো। নির্দিষ্ট কোন আকার নেই। মুহূর্তে মুহূর্তে বিভিন্ন আকৃতি নিচ্ছে আলোটা, কাঁপছে থিরথির করে। ক্রমেই বাড়ছে অর্গান পাইপের বাজনা, সেই সঙ্গে তীক্ষ্ণ ক্যাঁচকোঁচ আর চাপা চিৎকার যেন সঙ্গত করছে।

'নীল ভূত!' ফিসফিস করে বলল রবিন। অস্বস্তিবোধ উৎকণ্ঠার রূপ নিয়েছে। ভয়ে বুক কাঁপছে দুরু-দুরু। তীব্র আতঙ্কে রূপ নিতে বেশি দেরি নেই আর। কোন দরজা দিয়ে গেলে ইকো রুমে যাওয়া যায়, আন্দাজ করে নিল ওরা। ছুটল।

ধাক্কা দিয়ে পাল্লা খুলে ফেলল মুসা। প্রায় ছিটকে এসে পড়ল ইকো রুমে। হলের দিকে ছুটল।

হল, সদর দরজা পেরিয়ে বারান্দায় বেরিয়ে এল দু'জনে! তবু থামল না। সিঁড়ি টপকে নেমে চলল। মুসার সঙ্গে পেরে উঠছে না রবিন, পা ভাঙা। পেছনে পড়ে গেল সে।

দিব্যি দৌড়াচ্ছে মুসা। পা টেনে টেনে যত জোরে সম্ভব, ছুটছে রবিন।

অন্ধকার। ঢাল বেয়ে নামতে নামতে হঠাৎ পা পিছলাল রবিন। হুমড়ি খেয়ে পড়ল। বার দুই ডিগবাজি খেল, তারপর গড়াতে শুরু করল তার দেহ। কিছুতেই

ঠেকাতে পারছে না। কয়েক গড়ান দিয়ে একটা পাথরের স্তূপে এসে ধাক্কা খেয়ে থেমে গেল দেহটা। কান্নার মত ফোঁপানি বেরিয়ে এল মুখ দিয়ে।

ধরেই নিয়েছে রবিন, পেছনে তাড়া করে আসছে নীল অশরীরী। অপেক্ষা করছে ওটার জন্যে। বুকের ভেতরে হাতুড়ির বাড়ি পড়ছে যেন। হাপরের মত ওঠা নামা করছে বুক।

শব্দটা হঠাৎ কানে এল রবিনের। পায়ের আওয়াজ। চাপা। এক কদম…দুই কদম করে এগিয়ে আসছে। নিশ্চয় নীল ভূত! অন্ধকারে খুঁজছে তাকে!

থামছে না, এগিয়েই আসছে শব্দটা। কাছে, আরও কাছে। ঠিক পেছনে। থেমে গেল শব্দ।

ফিরে চাইবার সাহস নেই রবিনের। পাথরে মুখ ওঁজে পড়ে আছে।

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল মূর্তিটা। তার শ্বাস ফেলার চাপা ফোঁস ফোঁস কানে আসছে রবিনের। হঠাৎ পিঠে ছোঁয়া লাগল, হাতের আঙুল আলতো চাপ। তারপর আলতো ঘষা, ধীরে ধীরে ওপরের দিকে উঠে যাচ্ছে। নিশ্চয় গলা খুঁজছে, আন্দাজ করল রবিন। নড়ার শক্তি নেই যেন, অবশ হয়ে আসছে দেহ।

ঘাড়ের কাছে এসে থামল হাতটা। চাপ বাড়ল একটু। চেঁচিয়ে উঠল রবিন। তীক্ষ্ণ তীব্র চিৎকারে খান খান হয়ে ভেঙে গেল অখণ্ড নীরবতা। প্রতিধ্বনি তুলল পাহাড়ে পাহাড়ে বাড়ি খেয়ে।

তেরো

'তারপর? নীল ভূত তোমার ঘাড়ে হাত রাখল, তারপর কি হল?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

হেডকোয়ার্টারে বসে আছে তিন গোয়েন্দা। তিন দিন পর আবার এক জায়গায় মিলতে পেরেছে তিনজনে। বাবা-মার সঙ্গে স্যান ফ্রান্সিসকোয় আত্মীয়ের বাড়ি গিয়েছিল মুসা। লাইব্রেরিতে কাজের চাপ পড়েছিল রবিনের। এক সহকর্মী ছুটি নিয়েছিল, ফলে দু'জনের কাজ একাই করতে হয়েছে তাকে। কিশোর পড়েছিল বিছানায়, একনাগাড়ে তিনটে দিন। কথা বলার কেউ ছিল না। খালি বই পড়ে কাটিয়েছে।

'তারপর কি হল, বললে না?' রবিনকে চুপ করে থাকতে দেখে আবার জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'মানে…আমি চেঁচিয়ে উঠার পর?' ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করতে চাইছে না রবিন, বোঝা যাচ্ছে।

'নিশ্চয়। চেঁচিয়ে উঠলে, তারপর?'

'মুসাকেই জিজ্ঞেস কর না,' এড়িয়ে যেতে চাইছে রবিন। 'ও-ও তো ছিল সঙ্গে।'

'ঠিক আছে। মুসা, কি ঘটেছিল?'

ঢোক গিলল একবার মুসা। 'ইয়ে...আমি পড়লাম...মানে...'

'পড়ল তো রবিন, তুমি পড়লে কি করে?'

'ওর ঘাড়ে হাত রাখতেই চেঁচিয়ে উঠল। জোরে লাথি মেরে বসল আমার পায়ে। পায়ের তলায় পাথর ছিল, সামলাতে পারলাম না। পড়ে গেলাম ওর পিঠে। নিচে পড়ে ছটফট করতে লাগল ও, এঁকেবেঁকে সরে যাবার চেষ্টা করল। গলা ফাটিয়ে চেঁচাতে লাগল। বললঃ আমাকে ছেড়ে দাও, ভূত, প্লীজ! খামোকা ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করবে কেন...'

'কক্ষণো বলিনি আমি একথা!' চেঁচিয়ে প্রতিবাদ করল রবিন।

'হ্যাঁ, বলেছ। ভুলে গেছ এখন।'

'না, বলিনি!'

'বললেই বা কি হয়েছে?' রবিনের পক্ষ নিল কিশোর। 'ওর সাহস আছে, স্বীকার করতেই হবে। ওই অবস্থায় আমি পড়লেও ভয় পেতাম। ও তো প্যান্ট খারাপ করেনি। হ্যাঁ, তারপর?'

'জোরে জোরে বললাম, অত ভয় পাবার কিছু নেই। আমি মুসা। আমার কথা কানেই ঢুকল না যেন রবিনের। কানের কাছে মুখ নিয়ে চেঁচাতে তবে থামল। শান্ত হল। ওকে ধরে তুললাম।'

'ইচ্ছে করেই ভয় পাওয়ানোর চেষ্টা করেছ আমাকে তুমি!' রবিনের গলায় অনুযোগ।

'কসম খোদার, রবিন, তোমাকে ভয় পাওয়াব কি, আমারই তো অবস্থা তখন কাহিল। পেছন ফিরে দেখলাম তুমি নেই। ফিরতেই হল। খুব ভয়ে ভয়ে পা ফেলেছি। সারাক্ষণই মনে হয়েছে, এই বুঝি ধরল এসে নীল ভূতের বাচ্চা!'

দু'জনেই তাকাল কিশোরের দিকে।

ওদের কথা শুনছে না গোয়েন্দাপ্রধান। নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে চুপচাপ।

'দুজনেই উঠে দাঁড়ালে তোমরা, তারপর?' হঠাৎ প্রশ্ন করল কিশোর। 'আবিষ্কার করলে আতঙ্ক, ভয়, কিছুই নেই। এমনকি অস্বস্তিবোধও চলে গেছে, তাই না?'

চাওয়া চাওয়ি করল মুসা আর রবিন। কি করে আন্দাজ করল কিশোর? এই কথাটা সব শেষে বলে চমকে দেবে প্রধানকে, ভেবে রেখেছে ওরা।

'ঠিক,' জবাব দিল মুসা। 'কিন্তু তুমি জানলে কি করে?'

মুসার প্রশ্নটা যেন শুনতেই পায়নি কিশোর। আপনমনে বলল, 'তারমানে, টেরর ক্যাসলের বাইরে এলেই চলে যায় ওসব অনুভূতি! গুড। একটা কাজের কাজ

করে এসেছ।'

'তাই?' রবিনের প্রশ্ন।

'তাই। হ্যাঁ, ছবিগুলো নিশ্চয় শুকিয়েছে এতক্ষণে। আন না, দেখি। নাহ্, জ্বালিয়ে মারবে চাচা!' ভেন্টিলেটর বন্ধ করতে উঠে গেল কিশোর।

অর্গান পাইপ বসানোর কাজ শেষ করে ফেলেছেন রাশেদ চাচা। বোরিস আর রোভার তাঁকে সাহায্য করেছে। কিশোরও করেছে, বিছানায় শুয়ে শুয়ে। অর্গান পাইপের ওপর লেখা একটা বই খুঁটিয়ে পড়েছে সে। চাচাকে জানিয়েছে, কোন্ জোড়াটা কোথায় কিভাবে লাগাতে হবে। কাজ শেষ করেই বাজাতে বসে গেছে চাচা। ইয়ার্ডের আর সব কাজ বাদ দিয়ে তাঁর সঙ্গে জুটেছে বোরিস আর রোভার।

আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে বাজছে অর্গান। ভয়াবহ আওয়াজ। 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি'-র সুর বাজানোর চেষ্টা করছেন চাচা আনাড়ি হাতে। ঠিক হচ্ছে না। তবু তালে তালে মাথা দোলাচ্ছে দুই ব্যাভারিয়ান ভাই। তারিফ করছে সুরের। ওদের ধারণা, বাদক হিসেবে জুড়ি নেই রাশেদ পাশার।

শব্দের ধাক্কায় কাঁপছে পুরো ইয়ার্ড। ট্রেলারের ছাতের খোলা ভেন্টিলেটর দিয়ে আসছে আওয়াজ। কান ঝালাপালা করে দিতে চাইছে। সুর চড়া পর্দায় যখন উঠছে, থরথর করে কেঁপে উঠছে ট্রেলারের দেয়াল।

ভেন্টিলেটর বন্ধ করে দিয়ে ফিরে এল কিশোর।

ডার্করুম থেকে ছবি নিয়ে ফিরল রবিন।

ছবি পরীক্ষা করে দেখতে বসল কিশোর। ভেজা ভেজা রয়েছে এখনও। একটা করে ছবি টেনে নিয়ে বড় রীডিং গ্লাসের তলায় ফেলছে সে, ভাল করে দেখছে, তারপর ঠেলে দিচ্ছে রবিন আর মুসার দিকে।

অনেক সময় লাগিয়ে পরীক্ষা করল আর্মার সুট আর জন ফিলবির লাইব্রেরির ছবি। মুখ না তুলেই বলল, 'ভাল ছবি তুলেছ, রবিন। তবে আসল কাজটাই পারনি। নীল ভূতের ছবি তোলা দরকার ছিল।'

'ভাল বলেছ! অন্ধকারে কয়েক ডজন চেয়ার ডিঙিয়ে অর্গানের কাছে যাই! ছবি তোলার আগেই তো আমার ঘাড়টা মটকে দিত নীল হারামজাদা!'

'পালাতে পেরেছি এই যথেষ্ট, আবার ছবি!' যোগ করল মুসা। 'তীব্র আতঙ্ক চেপে ধরেছে। দিশেহারা হয়ে পড়েছি। তুমিও ছবি তুলতে পারতে না তখন।'

'ঠিকই, পারতাম না,' স্বীকার করল কিশোর। 'আতঙ্কিত হয়ে পড়লে মাথার ঠিক থাকে না। তবে, তুলে আনা গেলে খুব সুবিধে হত। কিনারা করা যেত রহস্যটার।'

চুপ করে রইল মুসা আর রবিন।

'অদ্ভুত একটা ব্যাপার ভেবে দেখেছ?' বলল কিশোর। 'টেরর ক্যাসলের ভূত সূর্য ডোবার আগেই দেখা দিয়েছে!'

'কিন্তু ক্যাসলের ভেতরে অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল,' প্রতিবাদ করল মুসা। 'বেড়ালেও দেখতে পেত কিনা সন্দেহ!'

'তবু, বাইরে তখনও সূর্য ডোবেনি। রাত নামার আগে ভূত বেরিয়েছে, এমন শোনা যায়নি কখনও। যাকগে। ওসব নিয়ে পরে ভাবা যাবে। এখন ছবিগুলো দেখি।'

আর্মার সুটের ছবির দিকে আবার চাইল কিশোর। 'এখনও চকচকে আছে সুটটা। মরচে পড়েনি।'

'ঠিকই,' সায় দিল রবিন। 'দুয়েকটা জোড়ায় মরচে দেখেছি শুধু। এছাড়া পুরো সুটটাই চকচকে।'

'আর এই যে, লাইব্রেরির বইগুলো। ধুলোয় মাখামাখি হয়ে থাকার কথা ছিল। নেই।'

'হালকা ধুলো ছিল,' বলল মুসা। 'তবে অনেক দিন পড়ে থাকলে যতটা থাকার কথা, ততটা নয়।'

'হুমম!' মমিকেসে রাখা কঙ্কালের ছবিটা টেনে নিল কিশোর। নিজের কঙ্কাল উপহার দেয়া! সত্যি অদ্ভুত!'

ঠিক এই সময় দড়াম করে শব্দ হল একটা! জঞ্জালের স্তূপ থেকে লোহার ভারি কিছু খসে পড়েছে, আছড়ে পড়েছে ট্রেলারের গায়ে। কারণ—অর্গান পাইপ। আরও জোরে বাজছে এখন।

'সর্বনাশ!' চেঁচিয়ে উঠল মুসা। 'ভূমিকম্প শুরু হবে!'

'কান খারাপ হয়ে গেল নাকি চাচার!' ভুরু কোঁচকাল কিশোর। আর সইতে পারছি না! বেরিয়ে যেতে হবে! জিনিসটা নিয়েই বেরিয়ে পড়ব।'

অপেক্ষা করে রইল রবিন আর মুসা, উৎসুক দৃষ্টি।

টেবিলের ড্রয়ার থেকে তিনটে লম্বা চক বের করল কিশোর। সাধারণ চক। একটা নীল, একটা সবুজ, অন্যটা সাদা।

'এগুলো কেন?' জানতে চাইল মুসা।

'আমাদের চিহ্ন রেখে যাবার জন্যে,' বলতে বলতেই সাদা চক নিয়ে দেয়ালে বড় একটা প্রশ্নবোধক আঁকল কিশোর। 'সাদা প্রশ্নবোধক, আমার চিহ্ন। সবুজ রবিনের, আর নীল তোমার। কোথাও পথ হারিয়ে ফেললে, এই চিহ্ন রেখে যাব আমরা। কে হারিয়েছি, কোন্ পথ দিয়ে গেছি, খুব সহজেই বুঝতে পারবে অন্য দু'জন। অনুসরণ করা সহজ হবে।'

'দারুণ!' বিড়বিড় করল মুসা। 'কিশোর, তোমার তুলনা হয় না!'

'অনেক সুবিধে এতে,' মুসার কথায় কান দিল না কিশোর। 'দেয়াল, দরজা জানালার পাল্লা, কিংবা অন্য যে কোনখানে চক দিয়ে প্রশ্নবোধক আঁকতে পারব আমরা। অন্য কারও চোখে পড়লেও তেমন কিছুই বুঝবে না। ভাববে, কোন দুষ্ট

ছেলের খেয়াল। অথচ আমাদের কাছে এটা মহামূল্যবান। এখন থেকে যার যার রঙের চক বয়ে বেড়াব আমরা। কখনও কাছছাড়া করব না। ঠিক আছে?'

মাথা কাত করে সায় জানাল অন্য দু'জন।

'আর হ্যাঁ,' আসল কথায় এল কিশোর। 'মিস্টার ক্রিস্টোফারের অফিসে ফোন করেছিলাম, আজ সকালে। কেরি জানিয়েছে, আগামীকাল সকালে স্টাফদের নিয়ে মীটিঙে বসবেন পরিচালক। সিদ্ধান্ত নেবেন, কোন ভুতুড়ে বাড়িতে ছবির শুটিং করবেন। তারমানে, কাল সকালের আগেই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে হবে আমাদের। তার মানে...'

'না!' চেঁচিয়ে উঠল মুসা। 'আমি পারব না! আমি আর যাব না টেরর ক্যাসলে। শিওর, ওই বাড়িতে ভূত আছে! কোন প্রমাণের দরকার নেই আমার।'

'বিছানায় শুয়ে শুয়ে অনেক ভেবেছি,' মুসার কথায় কোনরকম ভাবান্তর হল না কিশোরের। 'সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি, টেরর ক্যাসলে ভূত থাকলে, দেখে ছাড়ব। মিস্টার ক্রিস্টোফার কথা দিয়েছেন, আমাদের নাম প্রচার করবেন। এ-সুযোগ কিছুতেই হাতছাড়া করব না আমি। তোমাদেরও করা উচিত হবে না। বাড়িতে বলে আসবে, আজ রাতে আর না-ও ফিরে যেতে পার। আবার ঢুকব আমরা টেরর ক্যাসলে। আজই ভেদ করব এর রহস্য।'

চোদ্দ

চাঁদ নেই। গাঢ় অন্ধকারে ডুবে আছে ব্ল্যাক ক্যানিয়ন। তারার আলোয় আবছা দেখা যাচ্ছে টেরর ক্যাসলের অবয়ব।

'আরিব্বাপরে, কি অন্ধকার!' ফিসফিসিয়ে বলল কিশোর। 'যা থাকে কপালে, চল ঢুকে পড়ি।'

মুসার হাতে নতুন টর্চ। হাত খরচের পয়সা বাঁচিয়ে কিনেছে। আগের টর্চটা এখনও উদ্ধার করা যায়নি, নিশ্চয় পড়ে আছে মমিকেসের কাছে। টেরর ক্যাসলের লাইব্রেরিতে।

সিঁড়ি বেয়ে বারান্দায় উঠতে শুরু করল দু'জনে। এক পায়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা, সামান্য খোঁড়াচ্ছে কিশোর। অখণ্ড নীরবতা। তাদের পায়ের চাপা শব্দই অনেক বেশি জোরাল মনে হচ্ছে। হঠাৎ কাছের একটা ছোট ঝোপের ভেতরে শব্দ হল। বেরিয়ে ছুটে পালাল কি যেন! টর্চের আলো ফেলল মুসা। একটা খরগোশ।

'মনে জানান দিয়েছে ব্যাটার, আজ গোলমাল হবে ক্যাসলে,' বিড়বিড় করে বলল মুসা। 'বুদ্ধিমানের মত আগেই পালিয়ে যাচ্ছে।'

কোন জবাব দিল না কিশোর। বারান্দা পেরিয়ে দরজার সামনে দাঁড়াল। টান দিল হাতল ধরে। এক চুল নড়ল না পাল্লা।

'এসো, হাত লাগাও,' বলল কিশোর। 'আটকে গেছে দরজা।'

দু'জনে চেপে ধরল পিতলের বড় হাতল। জোরে হ্যাঁচকা টান লাগাল। খুলে চলে এল হাতল। টাল সামলাতে না পেরে ছিটকে পেছনে পড়ে গেল দু'জনে।

'উফফ!' ওপর থেকে কিশোরকে ঠেলে সরানর চেষ্টা করে বলল মুসা, 'সর সর! পেটের ওপর পড়েছ! দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে আমার!'

মুসার পেটের ওপর থেকে গড়িয়ে সরে এল কিশোর। উঠে দাঁড়াল।

মুসাও উঠল। টিপেটুপে দেখছে কোথাও ভেঙেছে কিনা বুকের পাঁজর। 'নাহ্, ঠিকই আছে মনে হচ্ছে!'

মুসার কথায় কান নেই কিশোরের। টর্চের আলোয় পরীক্ষা করে দেখছে হাতলটা।

'দেখেছ?' বলল কিশোর। 'হাতলের ছিদ্রে আটকে আছে স্ক্রুগুলো। মাথার খাঁজে খোঁচার দাগ।'

'ঘষা লেগেছে হয়ত কোন কারণে। গত পনেরো দিনে অনেকবার টানা হয়েছে ওটা ধরে। পুরানো জিনিস। সইতে পারেনি। খুলে এসেছে।'

'আমি অন্য কথা ভাবছি,' বলল কিশোর। 'খুলে আসতে সাহায্য করা হয়নি তো? মানে, ঢিল করে রাখা হয়নি তো?'

'খালি সন্দেহ!' বলল মুসা। 'দরজা খুলতে না পারলে ভেতরে ঢুকব কি করে? ফিরেই যেতে হবে।'

'না। ঢোকার অন্য কোন পথ বের করতে হবে। ওই যে,' পাশে আঙুল তুলে দেখাল কিশোর। 'জানালা। ওদিক দিয়ে চেষ্টা করে দেখি, চল।'

বারান্দার এক প্রান্তে চলে এল দু'জনে। দেয়ালে বড় বড় জানালা, ফ্রেঞ্চ উইণ্ডো। আঙিনার দিকে মুখ করে আছে। মোট ছয়টা। ঠেলেঠুলে দেখল ওরা। পাঁচটাই ভেতর থেকে আটকানো। একটা পাল্লার ছিটকিনি ভাঙা। আধইঞ্চি মত ফাঁক হয়ে আছে। ধরে টান দিল কিশোর। জোর লাগল না, হাঁ হয়ে খুলে গেল পাল্লা। ভেতরে উঁকি দিল সে। গাঢ় অন্ধকার।

টর্চের আলো ফেলল কিশোর। লম্বা একটা টেবিল চোখে পড়ল। চারপাশে চেয়ার। টেবিলের শেষ মাথায় কয়েকটা বাসন পড়ে আছে।

'ডাইনিং রুম,' নিচু গলায় বলল কিশোর। 'এদিক দিয়ে ঢুকতে পারব।'

জানালা টপকে ভেতরে এসে ঢুকল দু'জনে। আলো ফেলে দেখল কি কি আছে ঘরের ভেতরে। দেয়ালের একপাশে বসানো কাঠের বড় দেয়াল আলমারি। পাশে কয়েকটা তাক।

'দরজা কয়েকটা,' বলল কিশোর। 'কোনটা দিয়ে যাব?'

'ফিরে গেলেই ভাল...ওরেব্বাপরে!' চেঁচিয়ে উঠল মুসা। কথা বেরোল না আর। গলা টিপে ধরেছে যেন কেউ।

'কি, কি হল?' কাছে সরে এল কিশোর।
'ও-ওই যে!' তোতলাচ্ছে মুসা। 'ও-ওটা!'
মুসার নির্দেশিত দিকে তাকাল কিশোর। স্থির হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। আবছা আলোয় দেখল, লম্বা একটা মেয়ে চেয়ে আছে তাদের দিকে। পরনে তিনশো বছর আগের পোশাক। গলায় দড়ির ফাঁস। দড়ির অন্য মাথা বুকের ওপর দিয়ে ঝুলছে, নেমে এসেছে মাটিতে।
অপলকে চেয়ে আছে মুসা আর কিশোর। মেয়েটাও চেয়ে আছে ওদের দিকে।
মুসা ধরেই নিয়েছে, ওটা প্রেতাত্মা। বাড়ি ছিল ইংল্যাণ্ডে। ফাঁসি দিয়ে মরেছে, ওই যার কথা বলেছে হ্যারি প্রাইস।
দীর্ঘ কয়েকটা মুহূর্ত। তারপর কিশোর বলল, 'আমি বললেই সরাসরি ওটার ওপর আলো ফেলবে!...ফেল!'
নড়ে উঠল মেয়েটা। নড়ে উঠল একটা চকচকে কি যেন।
একই সঙ্গে ঘুরে গেল দুটো টর্চ।
কিন্তু কোথায় মেয়ে! একটা বড় আয়নার ওপর আলো পড়েছে। প্রতিফলিত হয়ে এসে লাগছে দু'জনের চোখে।
'আয়না!' অবাক গলায় বলল মুসা। 'তারমানে আমাদের পেছনে রয়েছে মেয়েটা!'
পাঁই করে ঘুরল মুসা। আলো ফেলল পেছন দিকে। নেই। কোন মেয়ে নেই। শুধু দেয়াল।
'চলে গেছে!' মুসার গলায় ভয়। 'আমিও যাচ্ছি। এই ভূতের আড্ডায় আর আমি নেই!' পা বাড়াল সে।
'দাঁড়াও!' সঙ্গীর হাত চেপে ধরল কিশোর। 'আয়নার দিকে চেয়েছিলাম আমরা। মেয়েটেয়ে নয়, চোখের ভুলও হতে পারে। বেশি তাড়াহুড়ো করে ফেলেছি। আরও সাবধান হওয়া উচিত ছিল আমাদের।'
'হলে না কেন? ক্যামেরা তো তোমার কাঁধেই। ছবি তুললে না কেন?'
'ভুলেই গিয়েছিলাম ক্যামেরার কথা।' নিজের ওপরই বিরক্ত কিশোর।
'মনে থাকলেও লাভ হত না। ছবি ওঠে না ভূতের। ওরা তো অশরীরী।'
অশরীরীর প্রতিবিম্ব হয় না,' মনে করিয়ে দিল কিশোর। 'মানে দাঁড়াচ্ছে, সে অশরীরী নয়। আয়নার ভেতরে ছিল, তাই বা বিশ্বাস করি কি করে! আয়না-ভূতের কথা শুনিনি কখনও! আবার যদি দেখা দিত মেয়েটা!'
'দেখা না দিলেই ভাল,' জোরে বলল মুসা, ভূতকে শোনাল যেন। 'আর দাঁড়িয়ে থেকে লাভ কি হবে? কি দেখবে? টেরর ক্যাসলে ভূত আছে, এটা প্রমাণ হয়ে গেল। চল, ফিরে গিয়ে সব জানাই মিস্টার ক্রিস্টোফারকে।'
'এখুনি ফিরে যাব কি? মাত্র-তো এলাম। আরও অনেক কিছু জানার আছে।

নীল ভূতকে না দেখে যাব না। ছবি তুলব ওটার,' স্থির শান্ত গলা কিশোরের।

কিশোর ভয় পাচ্ছে না, সে অত ঘাবড়াচ্ছে কেন?—নিজেকে ধমক লাগাল মুসা। কাঁধ ঝাঁকাল। 'ঠিক আছে। আচ্ছা, এক কাজ করলে তো পারি? এ ঘর থেকেই চকের চিহ্ন রেখে যাই আমরা।'

'ঠিক বলেছ! হল কি আমার! সব খালি ভুলে যাচ্ছি!'

খোলা জানালাটার কাছে এগিয়ে গেল কিশোর। এটা দিয়েই ঢুকেছে ওরা। পাল্লায় বড় করে একটা প্রশ্নবোধক আঁকল। ডাইনিং টেবিলে আঁকল একটা। তারপর গিয়ে দাঁড়াল আয়নার সামনে। প্রশ্নবোধক আঁকবে। 'আমরা এ ঘরে ছিলাম, জানবে হ্যানসন আর রবিন।'

'আমরা আর ফিরে না গেলে, তখন তো?' প্রশ্ন করল মুসা।

জবাব দিল না কিশোর। আয়নায় প্রশ্নবোধক আঁকার চেষ্টা করল। প্রথমবারে চকের দাগ বসল না ঠিকমত। দ্বিতীয়বার জোরে চাপ দিয়ে আঁকতে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ঘটল একটা অদ্ভুত কাণ্ড। নিঃশব্দে পেছনে সরে গেল আয়না, দরজার পাল্লার মত। ওপাশে প্যাসেজ। গাঢ় অন্ধকারে ঢাকা।

পনেরো

অবাক হয়ে অন্ধকার প্যাসেজের দিকে চেয়ে আছে দু'জন।

'ইয়াল্লা!' বলে উঠল মুসা। 'একটা গোপন পথ!'

'আয়নার পেছনে লুকানো!' ভুরু কুঁচকে গেছে কিশোরের। 'ভেতরে ঢুকব, দেখবে, কি আছে!'

মুসা প্রতিবাদ করার আগেই প্যাসেজে পা রাখল কিশোর। টর্চের আলোয় দেখা গেল, সরু লম্বা একটা প্যাসেজ। দু'পাশে অমসৃণ পাথরের দেয়াল। প্যাসেজের শেষ মাথায় একটা দরজা।

'এস,' ফিরে মুসাকে ডাকল কিশোর। 'কোথায় আমাদেরকে নিয়ে যায় প্যাসেজটা, দেখি।'

দ্বিধায় পড়ে গেল মুসা। প্যাসেজে ঢোকাটা মোটেই পছন্দ হচ্ছে না তার। এদিকে অন্ধকার ঘরে একা থাকতেও চায় না। শেষে ঢুকেই পড়ল।

আলো ফেলে দু'পাশের দেয়াল দেখল কিশোর। আয়না বসানো দরজাটা পরীক্ষা করল। সাধারণ দরজা, কাঠের পাল্লা। এক পাশে পাল্লার সমান একটা আয়না বসানো। কোন নব নেই, ছিটকিনি নেই।

'আশ্চর্য!' বিড়বিড় করল কিশোর। 'বন্ধ করে আবার খোলে কি করে! নিশ্চয় গোপন কোন ব্যবস্থা আছে!'

ঠেলে পাল্লাটা বন্ধ করে দিল কিশোর। মোলায়েম একটা ক্লিক করে আটকে

গেল পাল্লা।

'লেগেছে।' চেঁচিয়ে উঠল মুসা। 'বন্দি হয়ে গেলাম!'

'হুমম!' আপনমনেই মাথা দোলাল কিশোর। পাল্লার ধারে আঙুল চালিয়ে দেখল, কোন খাঁজ আছে কিনা, ধরে টান দেয়া যায় কিনা। কিছু নেই। দরজার ফ্রেম, পাল্লা মসৃণ করে চাঁছা। ফ্রেমের মধ্যে নিখুঁত ভাবে বসে গেছে পাল্লাটা, ফাঁক নেই।

'কোন না কোন উপায় আছেই খোলার,' বিড়বিড় করল কিশোর। 'ওপাশ থেকে তো খুব সহজেই খুলে গেল! ব্যাপারটা কি?'

'সেটা তুমি বোঝ,' বলল মুসা। 'আবার সহজে খুলে গেলেই বাঁচি! বেরিয়ে যেতে চাই আমি।'

'তেমন জরুরি অবস্থায় পড়লে ভেঙেই বেরোতে পারব। কাঠ বেশি পুরু না। অতার দরকার পড়বে মনে হয় না। প্যাসেজের আরেক দিকে তো পথ রয়েছেই।'

কিছু একটা বলতে গিয়েও থেমে গেল মুসা। ঘুরে রওনা হয়ে গেছে গোয়েন্দাপ্রধান।

দু'পাশের দেয়ালে আঙুলের গাঁট দিয়ে টোকা দিচ্ছে কিশোর, এক পা দু'পা করে এগিয়ে চলেছে। 'নিরেট,' এক সময় বলল সে। হঠাৎ থমকে দাঁড়াল। 'শুনতে পাচ্ছ!'

দাঁড়িয়ে পড়ল মুসাও। কান পাতল।

অর্গান বাজছে। বহুদূর থেকে ভেসে আসছে যেন শব্দটা। কাঁপা কাঁপা। সেই সঙ্গে মিশেছে তীক্ষ্ণ ক্যাঁচকোঁচ আর চাপা চিৎকার। এর আগের বার যেমন শুনেছিল মুসা, ঠিক তেমনি। পরিবর্তন নেই।

'নীল ভূত!' চাপা গলায় বলল গোয়েন্দা সহকারী। 'অর্গান বাজাচ্ছে!'

একদিকের দেয়ালে কান চেপে ধরল কিশোর। ধরে রইল দীর্ঘ এক সেকেণ্ড। সরে এল। 'দেয়াল ভেদ করেই যেন আসছে আওয়াজ! মানে কি? দেয়ালের ঠিক ওপাশেই আছে অর্গানটা!'

'বলতে চাইছ, এই দেয়ালের ওপাশেই আছে ভূতটা!' আঁতকে উঠল মুসা।

'আমার তাই ধারণা,' বলল কিশোর। 'যে করেই হোক, আজ ওর ছবি তুলবই। সম্ভব হলে কথাও বলব।'

'কথা বলবে?' গোঙানি বেরোল মুসার গলা থেকে। 'ভূতের সঙ্গে কথা বলবে!'

'যদি ধরতে পারি।'

'আমরা ধরার আগেই যদি আমাদেরকে ধরে? ঘাড় মটকে দেয়?'

'সে-ভয় কম,' জোর দিয়ে বলল কিশোর। 'এ-পর্যন্ত কারও কোন ক্ষতি করেনি ওটা। রেকর্ড নেই। এর ওপর অনেকখানি নির্ভর করছি আমি। বিছানায় শুয়ে শুয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অনেক ভেবেছি। একটা ধারণা জন্মেছে মনে। পরীক্ষা

করে দেখব আজ। আর খানিক পরেই জানব, ধারণাটা ঠিক কিনা।'

'যদি ভুল হয়? হঠাৎ যদি আজ ঠিক করে ভূতটা, তার দল বাড়াবে, তাহলে?'

'তখন মেনে নেব ভুল করেছি,' শান্ত গলায় বলল কিশোর। 'একটা আগাম কথা বলছি। আর কয়েক মুহূর্ত পরেই তীব্র আতঙ্ক এসে চেপে ধরবে আমাদেরকে।'

'কয়েক মুহূর্ত পরে!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল মুসা। 'তাহলে এখন কি বোধ করছি?'

'অস্বস্তি।'

'চল পালাই। দু'জনে ছুটে গিয়ে ধাক্কা দিলে ভেঙে যাবে পাল্লা। লাগাব ছুট?'

'না,' মুসার হাত চেপে ধরল কিশোর। 'অস্বস্তি, ভয় কিংবা আতঙ্ক কারও কোন ক্ষতি করে না। ওগুলো এক ধরনের অনুভূতি। আতঙ্কিত হয়ে উল্টোপাল্টা কিছু করে না বসলে, কোন ক্ষতিই হবে না তোমার।'

জবাবে কিছু একটা বলতে গিয়েও থেমে গেল মুসা। অদ্ভুত এক পরিবর্তন ঘটছে প্যাসেজে। বাজনার শব্দ আর নিজেদের কথাবার্তায় মগ্ন থাকায় এতক্ষণ খেয়াল করেনি ব্যাপারটা। কুয়াশা! আজব এক ধরনের ধোঁয়াটে কুয়াশা উদয় হয়েছে হঠাৎ। মেঝেতে কুয়াশা, দেয়ালের ধার ঘেঁষে কুয়াশা, সিলিঙে কুয়াশা।

ওপরে নিচে আলো ফেলল মুসা। উজ্জ্বল আলোয় দেখা গেল, পাক খাচ্ছে কুয়াশা, কুণ্ডলী পাকিয়ে ভাসছে বাতাসে। কোথা থেকে আসছে, বোঝা যাচ্ছে না। বাড়ছে ধীরে ধীরে। কুয়াশার ভেতর অদ্ভুত কিছু আকৃতি দেখতে পেল যেন সে।

'দেখ দেখ!' কাঁপা গলায় বলল মুসা। 'বিচ্ছিরি সব মুখ! ওই, ওই যে একটা ড্রাগন...একটা বাঘ...ওরেব্বাপরে! ভয়ানক এক জলদস্যু...'

'থাম!' বাধা দিয়ে বলল কিশোর। 'আমিও দেখছি ওসব! ছাতে বসে ভেসে যাওয়া মেঘের দিকে চাইলেও দেখতে পাবে ওই কাণ্ড। এই কুয়াশা কোন ক্ষতি করবে বলে মনে হয় না। তবে আতঙ্ক আসছে।'

সঙ্গীর হাতে হাতের চাপ বাড়াল কিশোর। কিশোরের হাত চেপে ধরল মুসা। ঠিকই বলেছে গোয়েন্দাপ্রধান। হঠাৎ তীব্র আতঙ্ক এসে ভর করল মনে, ছড়িয়ে পড়তে লাগল যেন সারা শরীরে। পায়ের তালু থেকে মাথার চাঁদি পর্যন্ত সব জায়গায়। অদ্ভুত শিরশিরে এক অনুভূতি চামড়ায়, কুঁচকে যাবে যেন। ছুটে পালাতে চাইছে সে। শক্ত করে তার হাত ধরে রেখেছে কিশোর, যেতে দিচ্ছে না। একই অনুভূতি হচ্ছে কিশোরেরও, কিন্তু পাথরের মত অটল দাঁড়িয়ে আছে সে।

আতঙ্কের একটা স্রোতের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে যেন ওরা। খেয়াল করল, কুয়াশা বাড়ছে, ঘন হচ্ছে। কুণ্ডলী পাকাচ্ছে, ঘুরছে ফিরছে, ভাসছে বাতাসে। সৃষ্টি করছে আজব আজব সব আকৃতি। 'কুয়াশাতঙ্ক,' অল্প অল্প কাঁপছে কিশোরের গলা। কিন্তু মুসার বাহুতে আঙুলের বাঁধন শিথিল হচ্ছে না সামান্যতম। 'অনেক বছর আগে এখানে ঢুকে এর কবলে পড়েছিল কে একজন। রেকর্ড আছে। লোক

তাড়ানর শেষ অস্ত্র টেরর ক্যাসলের। চল, ওপাশ দিয়ে বেরিয়ে পড়ি এবার। নীল ভূতকে ধরতে হবে। ও হয়ত ভেবে বসে আছে, এতক্ষণে ভয়ে অবশ হয়ে গেছি আমরা।'

'আমি যাব না,' কোনমতে বলল মুসা। দাঁতে দাঁত ঠোকাঠুকি করছে। 'আমার শরীর অবশ! কিছুতেই পা নাড়াতে পারছি না!'

কি ভাবল কিশোর। তারপর বলল, 'শোন, খামোকা ভয় পেয় না। ভাবনা-চিন্তা করে কি বুঝেছি আমি জান? বুঝেছি, টেরর ক্যাসল সত্যিই ভূতুড়ে...'

'সেকথাই তো তোমাকে বোঝাতে চেয়েছি এত দিন!'

'...তবে ভূতুড়ে করে তোলার পেছনে রয়েছে একজন মানুষ। জীবন্ত মানুষ। জন ফিলবি নিজে। যে আত্মহত্যা করেছে বলে লোকের ধারণা।'

'বল কি!' এতই অবাক হয়েছে মুসা, আতঙ্ক ভুলে গেছে।

'ঠিকই বলছি। ভূত সেজে এতগুলো বছর বাস করে আসছে টেরর ক্যাসলে। লোককে ভয় দেখিয়ে তাড়িয়েছে।

'কিন্তু তা কি করে হয়?' বিশ্বাস করতে পারছে না মুসা। 'আমরাও তো কয়েকবার ঢুকলাম ক্যাসলে। কখনও তার দেখা পাইনি। তাছাড়া খাবার? লোকের চোখ এড়িয়ে কি করে জোগাড় করে?'

'জানি না। দেখা হলে জিজ্ঞেস করব। আসলে লোককে ভয় দেখিয়ে তাড়ানো পর্যন্তই, এর বেশি কিছু করে না সে। কারও কোন ক্ষতি করে না। ক্যাসলটা তার দখলে থাকলেই খুশি। আতঙ্ক গেছে?'

'আরে! হ্যাঁ! চলে গেছে! আর ভয় পাচ্ছি না! পা-ও উঠছে। যেদিকে নিয়ে যাব, যাবে।'

'চল তাহলে। নীল ভূতের সঙ্গে দেখা করি।'

পা বাড়াল কিশোর। পেছনে চলল মুসা। ভয় কেটে গেছে। অবাক হয়ে ভাবছে, এতগুলো বছর একা টেরর ক্যাসলে কি করে বাস করল জন ফিলবি! আরও অনেক প্রশ্ন এসে ভিড় করছে মনে, কিন্তু জবাব খুঁজে পাচ্ছে না ওগুলোর।

প্যাসেজের শেষ মাথায় দরজার কাছে চলে এল ওরা। অবাক কাণ্ড! ধাক্কা দিতেই খুলে গেল পাল্লা। ওপাশে গাঢ় অন্ধকার। কি আছে না আছে, আলো না জ্বেলে বোঝার উপায় নেই। হঠাৎ বেড়ে গেল যেন বাজনার শব্দ। দেয়ালে প্রতিহত হচ্ছে। একটা বড় ঘরে এসে দাঁড়িয়েছে ওরা।

'প্রোজেকশনরুম,' ফিসফিস করে মুসার কানের কাছে বলল কিশোর। 'আলো জ্বেল না। চমকে দিতে হবে ওকে।'

দেয়ালের ধার ঘেঁষে পাশাপাশি এগিয়ে চলল দু'জনে। একটা কোণে এসে ঠেকল।

হঠাৎ গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠল মুসা। নরম হালকা কিছু একটা তার মুখ-

মাথা পেঁচিয়ে ধরেছে। টেনে সরাতে গিয়েই বুঝল, মখমলের ছেঁড়া পর্দার কাপড়।

কোণ ঘুরে আবার এগোল ওরা। কয়েক পা এগিয়েই থমকে দাঁড়াল কিশোর। হাত চেপে ধরল মুসা। ভাঙা অর্গানের সামনে নড়াচড়া করছে ম্লান নীল আলো। অন্ধকারেই বুঝতে পারল মুসা, ক্যামেরা রেডি করছে তার সঙ্গী।

'পা টিপে টিপে এগোবে,' ফিসফিস করে বলল কিশোর। 'ওর ঠিক পেছনে গিয়ে দাঁড়াব। ছবি তুলব।'

কাঁপা কাঁপা আলোটার দিকে চেয়ে রইল মুসা। হঠাৎই দুঃখ হল জন ফিলবির জন্যে। বেচারা! এতগুলো বছর নিরাপদে কাটিয়ে বুড়ো বয়েসে একটা ধাক্কা খাবে। মুখোশ খুলে যাবে টেরর ক্যাসলের ভূতের।

ওকে ভয় পাইয়ে দিতে হবে,' ফিসফিসিয়ে বলল মুসা। 'নাম ধরে ডাকলেই তো পারি। বোঝাতে পারি, আমরা ওর শত্রু নই, বন্ধু।'

'ভাল কথা,' সায় দিল কিশোর। 'তবে এখন না। আরও কাছে গিয়ে ডাকব।'

নীল আলোর দিকে আবার এগিয়ে চলল ওরা।

'মিস্টার ফিলবি!' হঠাৎ জোরে ডাক দিল কিশোর। 'মিস্টার ফিলবি, আমরা আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাই। বন্ধু।'

কিছুই ঘটল না। বেজেই চলল অর্গান, কাঁপতে থাকল নীল আলো।

'মিস্টার ফিলবি!' আরও কয়েক পা এগিয়ে আবার ডাকল কিশোর। 'আমি কিশোর পাশা। আমার সঙ্গে মুসা আমান। আপনার সঙ্গে শুধু কথা বলতে চাই।'

থেমে গেল বাজনা।

জোরে কেঁপে উঠল একবার আলোটা। তারপর চলতে শুরু করল। ধীরে ধীরে উঠে যাচ্ছে উপরের দিকে। ছাতের কাছে গিয়ে ঝুলে রইল।

আলোটার দিকে চেয়ে আছে কিশোর আর মুসা। এই সময়ই টের পেল, কেউ এসে দাঁড়িয়েছে তাদের পেছনে। ওরা কিছু বুঝে ওঠার আগেই ঘটল ঘটনা। ক্যামেরা হাতেই ধরা রইল কিশোরের। জ্বলে উঠল মুসার হাতের টর্চ। জালে আটকা পড়ে গেল দু'জনে। মাথার ওপর থেকে নেমে এসেছে জাল। এতই আচমকা, কিছু করারই সুযোগ পেল না ওরা। কাছেই দাঁড়িয়ে আছে দু'জন আরব।

ছুটতে গেল মুসা। জালের খোপে পা বেধে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল কার্পেটে ঢাকা মেঝেতে। পড়েই গড়ান খেল। পিছলে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করল জালের তলা থেকে। পারল না। আরও পেঁচিয়ে গেল। জালে আটকা পড়লে মাছের কেমন লাগে, অনুভব করতে পারল সে।

'কি-শো-র!' চেঁচিয়ে উঠল মুসা। 'আমাকে ছাড়াও!'

সাড়া এল না।

ঘাড় ফেরাল মুসা। টর্চটা হাতেই ধরা আছে। জ্বালল আবার। বুঝল, কেন সাড়া দিল না কিশোর।

আরেকটা জালে তারই মত আটকে পড়েছে কিশোর। ময়দার বস্তার মত তাকে তুলে নিয়েছে দুই আরব। একজন ধরেছে পায়ের দিক, আরেক জন কাঁধ। এগিয়ে যাচ্ছে দরজার দিকে।

জালের ভেতর আটকা পড়ে ছটফট করছে মুসা। নিজেকে ছাড়ানর চেষ্টা করে ব্যর্থ হল। গড়াগড়ি করে ছাড়াতে গিয়ে আরও জড়িয়ে ফেলল নিজেকে।

চিত হয়ে পড়ে রইল মুসা। হাতের কাছে এখনও আছে নীল আলো। কাঁপছে। গোয়েন্দা সহকারীর করুণ অবস্থা দেখে নীরব হাসিতে ফেটে পড়ছে যেন।

ষোলো

ম্লান হতে হতে এক সময় মিলিয়ে গেল নীল আলো। গাঢ় অন্ধকার চেপে ধরল যেন মুসাকে। নিজেকে ছাড়ানর চেষ্টা করল সে আরেকবার। পারল না। আরও বেশি শক্ত হল জালের জট। টর্চটা খসে গেছে হাত থেকে। খুঁজে বের করার উপায় নেই।

কায়দামত আটকেছি—ভাবল মুসা। বুড়ো এক অভিনেতাকে ধরতে এসে নিজেরাই ধরা পড়ে গেছে। খুব সুবিধের লোক মনে হল না দুই আরবকে। ওরা তাদের জন্যে অপেক্ষা করছিল অন্ধকারে।

হ্যানসন আর রবিনের কথা ভাবল মুসা। গিরিখাতে বাঁকের ওপাশে অপেক্ষা করছে ওরা। ওদের সঙ্গে কি আর কখনও দেখা হবে? আর কোন দিন কি বাড়ি ফিরে যেতে পারবে সে? মা-বাবার সঙ্গে দেখা হবে?

জীবনে এমন বিপদে আর পড়েনি মুসা। ভাবছে। এইসময় দেখা গেল আলো। এগিয়ে আসছে দুলেদুলে। কাছে এসে দাঁড়াল লম্বা এক লোক। হাতে একটা বৈদ্যুতিক লণ্ঠন। সিল্কের আলখেল্লা গায়ে।

ঝুঁকল লোকটা। হাতের লণ্ঠন তুলে ভাল করে দেখল মুসাকে। নিষ্ঠুর এক জোড়া চোখ, কেমন ঘোলাটে চাহনি।

হাসল লোকটা। ঝকঝক করে উঠল সোনার দাঁত। 'বোকা ছেলে! আর সবার মত ভয় পেয়ে চলে গেলেই ভাল করতে। এখন মরবে।' জবাই করার ভঙ্গিতে নিজের গলায় আঙুল চালাল লোকটা। বিচ্ছিরি ঘড়ঘড়ে একটা আওয়াজ করল।

ইঙ্গিতটা বুঝল মুসা। দুরুদুরু করে উঠল বুকের ভেতর। 'কে আপনি?' গলা দিয়ে কোলা ব্যাঙের আওয়াজ বেরোল তার। 'এখানে কি করছেন?'

'কি করছি?' হাসল লোকটা। 'পাতালে গেলেই বুঝতে পারবে।'

লণ্ঠন নামিয়ে রাখল লোকটা। উবু হয়ে দু'হাতে ধরে তুলে নিল মুসাকে। যেন একটা কোলবালিশ, এমনি ভাবে, কাঁধে ফেলল মুসার ভারি দেহটা। লণ্ঠনটা

আবার হাতে তুলে নিয়ে এগোল যেদিক থেকে এসেছিল।

কাঁধে ঝুলে থেকে চলেছে, কোথায় চলেছে, বুঝতে পারল না মুসা। একটা দরজা পেরোল লোকটা, প্যাসেজ পেরোল। একটা সিঁড়ির মাথায় এসে পৌঁছুল। ঘুরে ঘুরে নেমে গেছে সিঁড়ি। নেমে চলল লোকটা। অনেক ধাপ পেরিয়ে একটা করিডরে এসে পৌঁছুল। বাতাস ঠাণ্ডা, কেমন ভেজা ভেজা। করিডর পেরোল, আরও কয়েকটা দরজা পেরিয়ে এসে ছোট একটা ঘরে ঢুকল। জেলখানার সেলের মত ঘর। নিশ্চয় মাটির তলায়, অনুমান করল মুসা। দেয়ালে গাঁথা মরচে পড়া কয়েকটা রিং-বোল্ট।

সাদা বস্তার মত কি একটা পড়ে আছে এক কোণে। কাছে বসে আছে একজন আরব, বেঁটেটা। বিশাল এক ছুরিতে শান দিচ্ছে।

'আবদাল কোথায়?' আলখেল্লাধারী লোকটা জিজ্ঞেস করল। ধপাস করে সাদা বস্তাটার পাশে নামিয়ে রাখল মুসাকে।

'সিলভিয়াকে ডাকতে গেছে,' ভারি গলা আরবটার। ঘড়ঘড়ে আওয়াজ বেরোয় কথা বলার সময়। 'সিলভিয়া আর জিপসি কাটি লুকিয়ে রেখেছে মুক্তাগুলো। ছেলেদুটোকে নিয়ে কি করা যায়, সবাই বসে আলোচনা করব।'

'কিছুই করার দরকার নেই,' বলল এশিয়ান। 'এই ঘরে রেখে বাইরে থেকে দরজায় তালা দিয়ে চলে যাব। কেউ কখনও খুঁজে পাবে না ওদেরকে। মরে ভূত হয়ে যাবে শিগগিরই। টেরর কাসল আগলে রাখবে।'

'মন্দ হবে না,' হাসল আরব। গলায় কফ আটকে আছে যেন। 'তবে, ছুরিটায় কষ্ট করে শান দিয়েছি। একটু ব্যবহার না করলে কেমন দেখায়?'

দেখছে মুসা, বুড়ো আঙুলে ছুরির ধার পরীক্ষা করছে আরবটা। সামান্য নড়ে উঠল সাদা বস্তা। আড়চোখে দেখল মুসা। বুঝল, ওটা বস্তা নয়। জালে আটকানো গোয়েন্দাপ্রধান কিশোর পাশা।

'বড় দেরি করছে,' বলল আরবটা। 'যাই দেখি, সিলভিয়া কোথায়,' উঠে দাঁড়াল সে। ছুরিটা ঢুকিয়ে রাখল কোমরের খাপে। একবার চাইল মেঝেতে পড়ে থাকা ছেলে দুটোর দিকে। আলখেল্লাধারীকে বলল, 'এস আমার সঙ্গে। গোপন পথটা পরিষ্কার করতে হবে। আমরা এসেছিলাম, তার কোন প্রমাণ থাকা চলবে না। এদেরকে নিয়ে ভাবনা নেই। বেরোতে পারবে না জাল থেকে।'

'ঠিক। তাড়াতাড়ি করা দরকার আমাদের,' লণ্ঠনটা দেয়ালের বোল্ট রিঙে ঝোলাল আলখেল্লা। আলো পড়ছে এখন ছেলেদুটোর ওপর।

বেরিয়ে গেছে লোকদুটো। মিলিয়ে গেল ওদের পায়ের আওয়াজ। ভারি পাথর ঘষা লাগার আওয়াজ হল। তারপর সব চুপচাপ।

'মুসা,' ডাকল কিশোর, 'ঠিকঠাক আছ?'

'ঠিকঠাক বলতে কি বোঝাতে চাইছ?' নিরস গলায় বলল মুসা। 'হাড়টাড়

ভাঙেনি, এটুকু ঠিক আছি।'

'ভাল,' কিশোরের গলায় ক্ষোভ, নিজের প্রতি। 'বোকার মত তোমাকে এই বিপদে এনে ফেললাম! নিজের বুদ্ধির ওপর খুব বেশি ভরসা ছিল আমার!'

'খামোকা ভেবে মন খারাপ কোরো না,' বলল মুসা। 'একদল ডাকাত এসে আস্তানা গেড়েছে টেরর ক্যাসলে, কি করে জানবে? কোন প্রমাণ তো পাওয়া যায়নি আগে।'

'হ্যাঁ। আমি শিওর ছিলাম, টেরর ক্যাসলের সব কিছুর মূলে শুধু জন ফিলবি। কল্পনাই করিনি, আর কেউ থাকতে পারে। যা হবার হয়ে গেছে, ওসব নিয়ে ভেবে লাভ নেই। তা হাত-পা নাড়াতে পারছ কিছু?'

'পারছি। শুধু বাঁ হাতের কড়ে আঙুল।'

'আমি ডান হাত নাড়াতে পারছি,' বলল কিশোর। 'নিজেকে ছাড়াতে পারব মনে হয়। ঠিক জায়গায় পৌঁছাচ্ছি কিনা, দেখ।'

কাত হয়ে পড়ে আছে কিশোর। মুসা আছে চিত হয়ে। শরীরটাকে বান মাছের মত বাঁকিয়ে-চুরিয়ে অনেক কষ্টে কাত হল। কিশোরের পিঠ এখন তার দিকে। দেখল, কোমরের বেল্টে আটকানো সুইস ছুরিটা খুলে ফেলতে পেরেছে কিশোর। বিভিন্ন আকারের ছোটবড় আটটা ব্লেড, ছোট একটা স্ক্রু-ড্রাইভার আর একটা কাঁচিও লাগানো আছে বিশেষ কায়দায়।

কাঁচি দিয়ে জালের কয়েকটা ঘর কেটে ফেলল কিশোর। কাটা জায়গা দিয়ে বের করতে পারছে ডান হাত।

'বাঁ পাশে কাটতে পার কিনা দেখ,' ফিসফিস করে বলল মুসা। 'ওই হাতটা বের করতে পারলেই কেল্লা ফতে।'

ছোট্ট কাঁচি। নাইলনের শক্ত সুতায় তৈরি জাল। এগোতে চাইছে না কাজ। থামল না কিশোর। চেষ্টা চালিয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত মুক্ত করে ফেলল দুই হাত। কোমরের কাছে কাটা শুরু করল। নিচের দিকে ফুট খানেক কেটে ফেলেছে, এই সময় শোনা গেল পায়ের আওয়াজ। তাড়াতাড়ি কাটা জায়গাটা টেনে পিঠের দিকে নিয়ে গিয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল সে। দু'হাত ঢুকিয়ে নিল জালের ভেতর।

কয়েক মুহূর্ত পরেই ঘরে এসে ঢুকল এক বুড়ি। হাতে বৈদ্যুতিক লণ্ঠন। পরনে জিপসি-আলখেল্লা। কানে সোনার বড় বড় রিঙ।

'বেশ বেশ,' হাঁসের মত প্যাঁকপ্যাঁক করে উঠল যেন বুড়িটা। 'খুব আরামেই আছ দেখছি, বাছারা। জিপসি কাটির হুঁশিয়ারি তো মানলে না, বিপদে পড়বেই। আমার কথা শুনলে আর এ-অবস্থা হত না।'

লণ্ঠন তুলে দেখছে বুড়ি। হঠাৎই মনে হল তার, বড় বেশি স্থির হয়ে আছে ছেলেদুটো। কোন কথা বলছে না, নড়ছে না চড়ছে না। সন্দেহ হল। মুসার কাছে এসে দাঁড়াল। সন্দেহজনক কিছু দেখল না। ঘুরে কিশোরের পাশে গিয়ে দাঁড়াল।

'তুমি একটু কাত হও তো, বাছা,' প্যাকপ্যাক করে উঠল হাঁসের গলা। 'পারছ না? বেশ, এই যে, আমি সাহায্য করছি।' লণ্ঠনটা নামিয়ে রাখল সে।

জালের কাটা দেখে ফেলল বুড়ি। কিশোরের ডান হাতের কব্জি চেপে ধরল। মোচড় দিয়ে মুঠো থেকে নিয়ে নিল ছুরিটা। 'বাহ্, চমৎকার! পালানর চেষ্টা করছিলে, ছানারা!' হঠাৎ গলা চড়িয়ে ডাকল সে, 'সিলভি! দড়ি, দড়ি নিয়ে এস! শক্ত করে বাঁধতে হবে ছানাদুটোকে, নইলে উড়ে যাবে!'

'আসছি,' সাড়া এল মহিলাকণ্ঠে। কথায় ব্রিটিশ টান।

খানিক পরেই লম্বা একটা মেয়ে এসে দাঁড়াল দরজায়। হাতে দড়ির বাণ্ডিল।

'চালাক, ভীষণ চালাক ছানাদুটো,' বলল বুড়ি। 'শক্ত করে বাঁধতে হবে। এস, সাহায্য কর আমাকে।'

অসহায় ভাবে চেয়ে চেয়ে-সব দেখল মুসা। কোন সাহায্যই করতে পারল না বন্ধুকে। কিশোরের মাথা, গলা আর পিঠের জাল কাটল ওরা প্রথমে। দু'হাত পিঠের কাছে নিয়ে শক্ত করে বাঁধল দড়ি দিয়ে। টেনে হিঁচড়ে জাল খুলে নিল। তারপর বাঁধল পা। কব্জির বাঁধনের ওপর আরেক টুকরো দড়ি বাঁধল। একটা রিং বোল্টের সঙ্গে বেঁধে দিল দড়ির আরেক মাথা।

লম্বা এক টুকরো দড়ি দিয়ে মুসাকে বাঁধা হল এরপর। ওর জাল কাটা নেই কোন জায়গায়। কাজেই জাল ছাড়িয়ে নেবার দরকার মনে করল না বুড়ি। ওপর দিয়ে ঘুরিয়ে আনল কয়েক প্যাঁচ। বেঁধে দিল দড়ির দুই প্রান্ত।

'আর পালাতে পারবে না ছানারা,' বলল হাঁস-গলা। 'কোন দিনই আর বেরোতে পারবে না এখান থেকে। ওরা জবাই করে ফেলতে চাইছে, কিন্তু তার দরকার হবে বলে মনে হয় না। বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দিয়ে গেলে, এই পাতাল থেকে কখনই আর বেরোতে পারবে না এরা।'

'আমার দুঃখ হচ্ছে ওদের জন্যে,' বলল ইংরেজ মেয়েটা। 'চেহারা দেখে ভাল ছেলে বলেই মনে হচ্ছে।'

'খামোকা দরদ দেখিও না,' তীক্ষ্ণ হল হাঁসের গলা। 'সবাই একমত হয়েছে, ওদেরকে ছেড়ে দেয়া চলবে না। দলের সবার বিরুদ্ধে যেতে পার না তুমি। চল, কেটে পড়ি। সময়ই নেই। চিহ্নটিহ্নগুলো মুছে দিয়ে যেতে হবে আবার।'

দেয়ালে ঝোলানো লণ্ঠনটা নামিয়ে নিল বুড়ি। বেরিয়ে গেল।

মেঝেতে রাখা লণ্ঠনটা তুলে ছেলেদুটোর দিকে আবার তাকাল মেয়েটা। 'কেন এলে, ছেলেরা? কেন আর সবার মত দূরে থাকলে না? অর্গানের বাজনা একবার শুনেই পালায় লোকে, আর ফেরে না। কিন্তু তোমরা ঠিক ফিরে এলে আবার।'

'তিন গোয়েন্দা কখনও হাল ছাড়ে না,' গম্ভীর গলা কিশোরের।

'অনেক সময় হাল ছেড়ে দেয়াই ভাল,' বলল মেয়েটা। 'তো থাক, আমরা

যাই। আশা করি, অন্ধকারে ভয় পাবে না। গুডবাই।'

'যাবার আগে,' বলল কিশোর। আশ্চর্য শান্ত গলা। অবাক হল মুসা। 'একটা প্রশ্নের জবাব দেবে?'

'কি?' জানতে চাইল মেয়েটা।

'এখানে কি কুকাজ করছ তোমরা? কিসের দল?'

'বাহ্, সাহস আছে তোমার, ছেলে!' হাসল মেয়েটা। 'কুকাজ, না? হ্যাঁ, কুকাজই। আমরা স্মাগলার। এশিয়ার বিভিন্ন দেশ থেকে দামি জিনিসপত্র স্মাগল করে আনি, বিশেষ করে মুক্তো। টেরর কাসল আমাদের হেডকোয়ার্টার। লোকে জানে ভূতুড়ে বাড়ি। ধারেকাছে ঘেঁষে না। লুকানর দারুণ জায়গা। বহু বছর ধরে আছি আমরা এখানে।'

'কিন্তু ওই বিচিত্র পোশাক পরে আছ কেন? যেন সার্কাসের সং। লোকের নজরে পড়ে যাবে সহজেই।'

'আমাকে দেখলে তো নজরে পড়ব,' বলল মেয়েটা। 'হয়েছে, আর না। একটার জায়গায় তিনটা প্রশ্নের জবাব দিয়ে ফেলেছি। এবার যেতে হচ্ছে। গুডবাই।'

লণ্ঠন হাতে বেরিয়ে গেল মেয়েটা। শব্দ তুলে বন্ধ হয়ে গেল সেলের দরজা। ঘুটঘুটে অন্ধকার চেপে ধরল দুই গোয়েন্দাকে। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে মুসার। শুকনো ঠোঁটের ওপর একবার বুলিয়ে আনল জিভ।

'কিশোর!' খসখসে গলা মুসার! 'চুপ করে আছ কেন? কিছু বল। নইলে পাগল হয়ে যাব! যা নীরব!'

'উঁ!' আনমনা শোনাল কিশোরের গলা। ভাবছিলাম। খাপেখাপে মেলাতে চাইছি কিছু ব্যাপার।

'ভাবছিলে! এই সময়ে!'

'হ্যাঁ। খেয়াল করেছ, এখান থেকে বেরিয়ে ডানে ঘুরেছে জিপসি কাটি? ওদিকে করিডর ধরে এগিয়েছে?'

'তাতে কি?'

'আমরা যেদিক থেকে এসেছি তার উল্টো দিকে গেল। সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠেনি সে। আরও পাতালে নেমেছে। এর মানে কি? মাটির তলা দিয়ে বেরোনর কোন গোপন পথ আছে। কোন গোপন সুড়ঙ্গ। ওই পথে বেরোলে লোকের চোখে পড়বে না।'

কিশোরের মাথা ঠাণ্ডা রাখার ক্ষমতা দেখে অবাক না হয়ে পারল না মুসা। পাতালের এই সেলে, এই বিপদে থেকেও ঠিক খাটিয়ে নিচ্ছে মগজের ধূসর কোষগুলোকে!

'অনেক কিছুই তো ভাবছ,' বলল মুসা। 'এখান থেকে কি করে বেরোনো

যায়, ভেবেছ কিছু?'

'না,' সোজাসাপ্টা জবাব দিল কিশোর। 'ভেবে লাভ নেই। পরিষ্কার বুঝতে পারছি, বাইরের সাহায্য ছাড়া এখান থেকে বেরোনর কোন উপায় নেই আমাদের। বাস্তবকে স্বীকার করে নেয়াই ভাল। আমাকে ক্ষমা কর, মুসা। আমার ভুলের জন্যেই ঘটল এটা।'

চুপ করে রইল মুসা। বলার নেই কিছুই। কি বলবে?

ঘুটঘুটে অন্ধকার। অখণ্ড নীরবতা। কাছেই কোথাও ছুটোপুটি করছে একটা ইঁদুর, শোনা যাচ্ছে। আরেকটা একঘেয়ে শব্দও কানে আসছেঃ টুপ্...টুপ্...টুপ্!

সময় নিয়ে খুব আস্তে আস্তে পড়ছে পানির ফোঁটা। তারই আওয়াজ।

সতেরো

উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে রবিন আর হ্যানসন। এক ঘন্টা হল গেছে মুসা আর কিশোর, ফেরার নাম নেই। প্রতি পাঁচ মিনিট পরপর রোলস রয়েস থেকে বেরিয়ে আসছে রবিন, ব্ল্যাক ক্যানিয়নের দিকে তাকাচ্ছে। বন্ধুরা আসছে কিনা দেখছে। প্রতি দশ মিনিট পর পর বেরোচ্ছে হ্যানসন।

'মাস্টার রবিন,' আর থাকতে না পেরে বলল হ্যানসন। 'মনে হয় এবার যাওয়া উচিত।'

'কিন্তু গাড়ি ফেলে যাবার হুকুম নেই আপনার,' মনে করিয়ে দিল রবিন। 'চোখের আড়াল করা নিষেধ।'

'তা হোক,' বলল হ্যানসন। 'মানুষের জীবনের কাছে রোলস রয়েস কিছু না। আমি ওদের খুঁজতে যাব।'

গাড়ি থেকে বেরিয়ে এল হ্যানসন। বুট খুলে বড় একটা বৈদ্যুতিক লণ্ঠন বের করল। পাশে এসে দাঁড়িয়েছে রবিন। তার দিকে চেয়ে বলল, 'আমি যাচ্ছি।'

'আমিও যাব,' বলল রবিন।

'ঠিক আছে, আসুন যাই।'

বুট বন্ধ করতে গিয়েও থেমে গেল হ্যানসন। বড় একটা হাতুড়ি বের করে নিল, দরকার পড়তে পারে। একটা অস্ত্র তো বটেই।

রওনা হয়ে পড়ল দু'জনে। দ্রুত হাঁটছে হ্যানসন। ভাঙা পা নিয়ে তার সঙ্গে পেরে উঠছে না রবিন। তবু কাছাকাছি থাকার যথেষ্ট চেষ্টা করছে।

টেরর ক্যাসলের বারান্দায় এসে উঠল দু'জনে। দরজা বন্ধ। হাতল ঝুলে পড়ে আছে। খোলা যাবে না পাল্লা।

'এদিক দিয়ে ঢোকেননি,' বলল হ্যানসন। 'তাহলে? কোন্‌দিক দিয়ে গেলেন?' এদিক ওদিক তাকাল সে। 'ওই জানালাগুলো দেখা দরকার!'

পাল্লাখোলা জানালাটার সামনে এসে দাঁড়াল দু'জনে। আলো ফেলল রবিন। চোখে পড়ল সাদা চকে বড় করে আঁকা একটা '?'। 'এদিক দিয়েই গেছে ওরা!' সংক্ষেপে চিহ্নটার মানে বুঝিয়ে বলল রবিন।

জানালা দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল হ্যানসন। রবিনকে ঢুকতে সাহায্য করল। লণ্ঠনের আলোয় বুঝতে পারল ওরা, একটা ডাইনিং রুমে এসে ঢুকেছে।

'এরপর? এরপর কোনদিকে গেলেন!' খুঁজছে হ্যানসন। 'কয়েকটা দরজা। কোথাও চিহ্ন নেই।'

এই সময় রবিনের চোখ পড়ল আয়নার ওপর। বড় করে আঁকা রয়েছে প্রশ্নবোধক চিহ্ন? দেখাল হ্যানসনকে।

'অসম্ভব!' বলল হ্যানসন। 'আয়নার ভেতর দিয়ে কেউ যেতে পারে না! দেখতে হচ্ছে!'

আয়নাটার চারপাশে খুঁজে কোন ফোকর দেখতে পেল না ওরা। দরজার চিহ্ন নেই। কি ভেবে আয়নার ফ্রেম ধরে ঠেলা দিল হ্যানসন। ওদেরকে অবাক করে দিয়ে খুলে গেল পাল্লা। ওপাশে অন্ধকার প্যাসেজ।

'গোপন দরজা!' বিস্মিত হ্যানসন। 'নিশ্চয় এদিক দিয়ে গিয়েছেন। চলুন, আমরাও যাই।'

গাঢ় অন্ধকার সুড়ঙ্গে ঢুকতে ভয় পাচ্ছে রবিন, আবার একাও থাকতে পারবে না ডাইনিং রুমে। শেষে যাওয়াই ঠিক করল।

ঢুকে পড়ল হ্যানসন। পেছনে ঢুকল রবিন। দেয়ালে প্রশ্নবোধক। চিহ্ন ধরে ধরে এগিয়ে চলল দু'জনে।

ও-প্রান্তের দরজায়ও আঁকা আছে প্রশ্নবোধক। ওপাশে চলে এল দু'জনে। প্রোজেকশন রুমে।

উজ্জ্বল আলোয় ঘরের অনেকখানিই পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। একসারি চেয়ারের ধার দিয়ে পাইপ অর্গানটার দিকে এগোল ওরা। একটা কোণে এসে থামল। নিচে পড়ে আছে পর্দার একটা ছেঁড়া টুকরো। কোণ ঘুরে এগিয়ে চলল আবার। কিন্তু কই? কিশোর আর মুসার আর তো কোন চিহ্ন নেই।

এই সময়ই জিনিসটা চোখে পড়ল রবিনের। একটা সিটের তলায় পড়ে আছে। এগিয়ে গিয়ে তুলে নিল সে। 'হ্যানসন! মুসার টর্চ! নতুন কিনেছে!'

'নিশ্চয় ইচ্ছে করে ফেলে যাননি!' আশপাশের মেঝে পরীক্ষা করল হ্যানসন। 'দেখুন দেখুন। ধুলোতে অনেক পায়ের ছাপ। আর এই যে এখানে, কেমন আধ খাপচা হয়ে সরে গেছে ধুলো। মনে হচ্ছে, ধস্তাধস্তি হয়েছে। আরে, একটা চকের টুকরো পড়ে আছে।'

বেশ কয়েকটা জুতোর ছাপ একদিকে এগিয়ে যেতে দেখল ওরা। পুরু হয়ে জমেছে ধুলো, তাতে ছাপগুলো স্পষ্ট। ছাপ ধরে ধরে এগোল দু'জনে।

সামনের সারির সিটগুলোর সামনে দিয়ে এগিয়ে গেছে ছাপ।

একদিকের শেষ প্রান্তে এসে মোড় নিয়েছে ডানে। পর্দার পাশের একটা দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেছে ওপাশে। একটা হলে এসে থামল ওরা। এক ধার থেকে নেমে গেছে সিঁড়ি। আরেক দিক থেকে উঠে গেছে। দু'দিকেই গেছে জুতোর ছাপ।

'এবার কোন্‌দিকে যাব!' দ্বিধায় পড়ে গেল হ্যানসন। উঠে যাবার সিঁড়িটার দিকে চেয়ে আছে। এগিয়ে গেল। কয়েক ধাপ উঠেই থেমে গেল আবার। মাথা নাড়ল। 'কেন যেন মনে হচ্ছে, এদিক দিয়ে যায়নি'। চলুন, আগে নেমে গিয়েই দেখি।'

নেমে যাবার সিঁড়ির কাছে চলে এল ওরা। নিচের দিকে আলো ফেলেই চেঁচিয়ে উঠল রবিন, 'ওই যে, চকভাঙা! এদিক দিয়েই গেছে!'

'মাস্টার কিশোরের ওপর শ্রদ্ধা বেড়ে যাচ্ছে আমার,' বলল হ্যানসন।

'কি হয়েছে ওদের, আপনার কি মনে হয়?' সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বলল রবিন।

'ঠিক বুঝতে পারছি না,' বলল হ্যানসন। 'তবে এটা ঠিক, নিজেরা হেঁটে যাননি। তাহলে দেয়ালে প্রশ্ন এঁকে যেতেন। চক ভেঙে ফেলে যেতে হত না। নিশ্চয় বয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।'

'কিন্তু কে বয়ে নিয়ে যাবে! ভূত? আরে, কোথায় নেমে চলেছি! পাতালেই চলে এসেছি মনে হচ্ছে!'

'হ্যাঁ। ওই যে, দেখতে পাচ্ছেন? একটা ঘরে শেষ হয়েছে সিঁড়ি। ইংল্যাণ্ডে দেখেছি আমি এ-ধরনের ঘর। একটা দুর্গে। পাতাল কক্ষ। ডানজন বলে!'

সিঁড়ি শেষ। ঘরটা থেকে তিনটে পথ তিন দিকে গেছে। তিনটে সুড়ঙ্গ মুখ দেখা যাচ্ছে। গাঢ় অন্ধকার ওপাশে। চকের চিহ্নও নেই আর। কোন্‌দিকে যাবে?

'এক কাজ করি, বাতি নিভিয়ে দিই,' বলল হ্যানসন। 'সত্যি সত্যি ভূত হলে অন্ধকারে নড়াচড়া করার কথা। দেখি, কি ঘটে!'

গাঢ় অন্ধকারে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল দু'জনে। কানখাড়া। যে-কোন রকম শব্দ শোনার জন্যে তৈরি। অখণ্ড নীরবতা। বাতাস কেমন ভেজা ভেজা, ভ্যাপসা গন্ধ।

কতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে বলতে পারবে না। হঠাৎই কানে এল অতি মৃদু একটা শব্দ। পাথরের ওপর আলতো ঘষা লাগল যেন আরেকটা পাথরের। কয়েক মুহূর্ত পরেই দেখা গেল ম্লান আলো। মাঝখানের সুড়ঙ্গের ভেতরে। ওদিক থেকেই এসেছে শব্দ।

কেঁপে কেঁপে এগিয়ে আসছে আলো। বোকামি করে বসল হ্যানসন। চেঁচিয়ে ডাকল, 'মাস্টার কিশোর!'

থমকে থেমে গেল আলোর অগ্রগতি। ঘুরে যাচ্ছে। ক্ষণিকের জন্যে দু'জনের চোখে পড়ল মেয়েমানুষের পোশাকের এক অংশ। তারপরই দ্রুত মিলিয়ে গেল

আলো।

'ছুটুন।' রবিনের উদ্দেশ্যে চেঁচিয়ে উঠল হ্যানসন। ছুটতে শুরু করেছে। জ্বলে উঠেছে তার হাতের আলো। ঢুকে পড়ছে মাঝখানের সুড়ঙ্গে।

হ্যানসনের পিছু পিছু ছুটল রবিন! বেশিদূর এগোতে পারল না। শোফারের পিঠের ওপর এসে প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ল।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাঁপাচ্ছে হ্যানসন। সামনে দু'পাশে পাথরের দেয়াল। পথ নেই। এখানে এসে শেষ হয়ে গেছে সুড়ঙ্গ।

'ওই দেয়ালের ভেতর দিয়ে চলে গেছে!' বিশ্বাস করতে পারছে না যেন হ্যানসন। আলো তুলে পরীক্ষা করে দেখল। না..কোন গোপন দরজা আছে বলে তো মনে হয় না! কি ভেবে কোমরে ঝোলানো হাতুড়িটা খুলে নিল। ঠোকা দিল সামনের পাথরের দেয়ালে। 'আরে! ফাঁপা! নিশ্চয় গোপন দরজা!'

হাতুড়ি নিয়ে জোরে জোরে ঘা মারতে লাগল হ্যানসন। শিগগিরই একটা ফোকর হয়ে গেল। শক্ত তারের জালে সিমেন্টের পুরু আস্তর লাগিয়ে তৈরি হয়েছে দরজার পাল্লা। ওপাশ থেকে আটকানো। দেখে মনে হয় সাংঘাতিক ভারি, আসলে পাতলা। জোরে জোরে কয়েক ঘা মেরেই জাল থেকে সিমেন্ট খসিয়ে দিল সে। কাঁধ দিয়ে জোরে জোরে ধাক্কা মারতে লাগল তারের জালে। কয়েক ধাক্কায়ই ফ্রেম থেকে খুলে চলে এল জালের এক প্রান্ত । ওই প্রান্ত ধরে টেনে ফ্রেম সহ খুলে নিয়ে এল সে।

'চলুন, দেখি!' বলেই সামনে পা বাড়াল হ্যানসন। 'বেটি এদিক দিয়েই গেছে!'

হ্যানসনের সঙ্গে পেরে উঠছে না রবিন। শেষে তার একটা হাত ধরে টেনে নিয়ে চলল শোফার।

খানিকটা এগোতেই সরু হয়ে এল সুড়ঙ্গ। সোজা হতে পারছে না হ্যানসন। মাথা নুইয়ে হাঁটতে হচ্ছে। যতই সামনে বাড়ছে, আরও সরু হয়ে আসছে সুড়ঙ্গ। মাথা নিচু করে রাখতে হচ্ছে, সামনের দিকে সোজা চাইতে পারছে না। হঠাৎ তার কপালে এসে জোরে লাগল একটা কি যেন! চমকে যাওয়ায় হাত থেকে খসে পড়ে গেল লণ্ঠন। নিভে গেল।

রবিনের গালেও এসে বাড়ি মারল কি একটা। ফড়ড়ড়ড় করে মাথার ওপর দিয়ে উড়ে চলে গেল কি যেন! 'বাদুড়!' চেঁচিয়ে উঠল সে। 'হ্যানসন, বাদুড়ে আক্রমণ করেছে!'

'চুপ করুন, শান্ত হোন!' নিচু হয়ে বসে লণ্ঠন খুঁজছে হ্যানসন! 'ভয় পাবেন না!'

কিন্তু ভয় না পেয়ে উপায় আছে! একের পর এক এসে গায়ে মাথায় মুখে ঝাঁপিয়ে পড়ছে ওগুলো। একটা এসে বসে পড়ল মাথায়। চেঁচিয়ে উঠল রবিন।

থাবা মেরে ওটাকে ফেলে দিতে দিতে বলল, 'হ্যানসন ভ্যাম্পায়ার! সব রক্ত খেয়ে নেবে!'

'ওসব গপ্পো!' অভয় দেবার চেষ্টা করল হ্যানসন। 'ভ্যাম্পায়ার বলে কিছু নেই!'

লণ্ঠনটা খুঁজে পেয়েছে হ্যানসন। সুইচে খামোকাই টেপাটেপি করল। বার দুই ঝাঁকুনি দিল। জ্বলল না আলো। 'বিগড়ে গেছে! বিপদেই পড়ে গেলাম দেখছি! এখন উপায়!'

হঠাৎ কোমরে হাত পড়ল রবিনের, শক্ত কিছু একটার ছোঁয়া লাগল। 'আছে হ্যানসন, মুসার টর্চটা কোমরে ঝুলিয়ে নিয়েছিলাম।'

জ্বলে উঠল টর্চ। উড়ন্ত প্রাণীগুলোকে দেখল ওরা। একটা দুটো নয়, ডজন ডজন। বড় আকারের কাকাতুয়া। আলো দেখে তীক্ষ্ণ চিৎকার করতে করতে ছুটে এল। ঠোকর মেরে টর্চের কাঁচই ভেঙে দেবে হয়ত। তাড়াতাড়ি আলো নিভিয়ে ফেলল রবিন।

বাড়ছেই পাখির সংখ্যা। স্রোতের মত একটানা আসছে সরু সুড়ঙ্গ দিয়ে। আছড়ে পড়ছে গায়ে মুখে মাথায়। ইতিমধ্যেই কপালে গোটা দুয়েক ঠোকর লেগে গেছে রবিনের। ফুলে গেছে। ব্যথা করছে। চোখে ঠোকর লাগলে সর্বনাশ!

'এগোনো যাবে না,' চেঁচিয়ে বলল হ্যানসন। 'আসুন, পিছিয়ে যাই।'

অন্ধকারে রবিনের হাত ধরে টেনে নিয়ে চলল হ্যানসন। অনেকখানি পিছিয়ে আসার পর কমে এল পাখি। সুড়ঙ্গের শেষ মাথায় ছুটোপুটি করছে পাখিগুলো, তীক্ষ্ণ চিৎকার ভেসে আসছে। আলো জ্বাললেই হয়ত উড়ে আসবে। তারের দরজাটা তুলে আগের জায়গায় দাঁড় করিয়ে দিল হ্যানসন। সেই ছোট ঘরটায় ফিরে এল আবার দু'জনে।

'মনে হচ্ছে, ওই সুড়ঙ্গ দিয়ে নেয়া হয়নি ওঁদেরকে,' বলল হ্যানসন। 'দরজা খোলার সময় নামিয়ে রাখতেই হত। সেই সুযোগে কোন চিহ্ন রেখে যেতেন মাস্টার কিশোর।'

একমত হল রবিন।

হ্যানসন বলল আবার, 'এই ঘর পর্যন্ত এসেছেন ওঁরা, কোন সন্দেহ নেই। তারপর কোন একটা সুড়ঙ্গ দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। মাঝখানেরটা দেখলাম। এবার বাঁয়েরটা দেখি। তারপর ডানেরটা দেখব। ডাকতে ডাকতে এগোব। কাছে পিঠে থেকে থাকলে, সাড়া দেবেন।'

মন্দ বলেনি হ্যানসন। তার কথায় সায় জানাল রবিন।

টর্চ জ্বালল রবিন। প্রথমে এগিয়ে গেল বাঁয়ের সুড়ঙ্গের দিকে। সুড়ঙ্গ মুখে দাঁড়িয়ে জোরে চেঁচাল হ্যানসন, 'মাস্টার কিশোর, আপনারা কোথায়!

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই জবাব এল। কার গলা, চিনতে ভুল হল না হ্যানসনের।

রবিনের হাত থেকে টর্চটা নিয়ে এগোল।

কয়েক গজ এগোতেই দেয়ালের গায়ে দরজা দেখতে পেল। ঠেলা দিতেই খুলে গেল ভেজানো পাল্লা। আলো ফেলল ভেতরে।

'উফফ! রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে!' বাঁধনের দাগগুলো জোরে জোরে ডলছে মুসা।

কিশোরও ডলছে। সংক্ষেপে হ্যানসন আর রবিনকে জানাল, কি করে বন্দি হয়েছিল ওরা।

'তাড়াতাড়ি যাওয়া দরকার,' বলল হ্যানসন। 'পুলিশ নিয়ে আসতে হবে। ভয়ানক লোক ওরা! আমরা না এলেই তো গেছিলেন!'

ছোট ঘরটায় ফিরে এল ওরা। সিঁড়ির দিকে পা বাড়াতে গিয়েও থমকে দাঁড়াল কিশোর। কান পাতল। 'কিসের শব্দ!'

'পাখি!' বলল রবিন।

'পাখি!'

কি করে মেয়েমানুষটাকে তাড়া করে গিয়েছিল, জানাল রবিন। সবশেষে জানাল, কি পাখি ওগুলো।

'কাকাতুয়া!' কিশোরের মুখ দেখে মনে হল বোলতা হুল ফুটিয়েছে। 'জলদি, এস আমার সঙ্গে!' এক থাবায় হ্যানসনের হাত থেকে টর্চটা নিয়ে ছুটল। ঢুকে পড়ল মাঝের সুড়ঙ্গে।

আগে আগে ছুটছে কিশোর, পেছনে অন্যেরা। তারের দরজাটার কাছে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। একটানে ফেলে দিল পাল্লা। আবার ছুটল। ওর সঙ্গে তাল রাখাই কঠিন হয়ে পড়েছে অন্যদের জন্যে।

ক্রমে সরু হয়ে আসছে সুড়ঙ্গ। আলো দেখে উড়ে এল পাখির ঝাঁক। ঝুপ করে বসে পড়ল কিশোর। আলো নিভিয়ে দিল। সঙ্গীদের উদ্দেশ্যে বলল, 'হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে হবে।'

এগিয়ে চলেছে ওরা। সবার আগে কিশোর। মাঝে মাঝে টর্চ জ্বেলে দেখে নিচ্ছে পথ। মাথার উপরে উড়ছে পাখিগুলো, হুটোপুটি করছে। বসার জায়গা পাচ্ছে না। অন্ধকারে বেরোনর পথ পাচ্ছে না। আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে। আলো দেখলেই ডাইভ দিয়ে নেমে আসছে। তাড়াতাড়ি আবার নিভিয়ে দিতে হচ্ছে টর্চ।

এঁকেবেঁকে এগিয়ে গেছে সুড়ঙ্গ। একটা জায়গায় এসে আর বাঁক নেই, সোজা এগিয়েছে। সামনে অন্ধকার ফিকে হয়ে এসেছে। ওটাই সুড়ঙ্গমুখ।

কাঠের পাল্লা দিয়ে দরজা লাগানো হয়েছে সুড়ঙ্গমুখে। হাঁ করে খুলে আছে এখন পাল্লাদুটো। বেরিয়ে এল কিশোর। তারার আলোয় দেখল, বিরাট এক খাঁচায় এসে ঢুকেছে।

একে একে অন্যেরাও বেরিয়ে এল সুড়ঙ্গের বাইরে, খাঁচার ভেতরে।

'কাকাতুয়ার খাঁচা এটা,' বলল কিশোর। 'হ্যারি প্রাইসের পাখি।'

টেরর ক্যাসল থেকে ওই গোপন সুড়ঙ্গ চলে এসেছে, পাহাড়ের তলা দিয়ে। ব্ল্যাক ক্যানিয়ন থেকে পাহাড় ঘুরে গেলে হ্যারি প্রাইসের বাড়ি কয়েক মাইল। অথচ পাহাড়ের তলা দিয়ে মাত্র কয়েক শো ফুট।

এগিয়ে গেল কিশোর। জোরে ঠেলা দিল খাঁচার দরজায়। ঝটকা দিয়ে খুলে গেল দরজা। বেরিয়ে এল বাইরে। সামনেই হ্যারি প্রাইসের বাংলো।

ফিসফিসিয়ে সঙ্গীদেরকে বলল কিশোর, 'চমকে দেব ওদের। চল, যাই।'

নিঃশব্দে বাংলোর দরজার কাছে এসে দাঁড়াল ওরা। বেলপুশ টিপে দিল কিশোর।

কয়েক মুহূর্ত পরেই খুলে গেল দরজা। দাঁড়িয়ে আছে হ্যারি প্রাইস। চোখে অবাক দৃষ্টি। কুৎসিত দেখাচ্ছে চকচকে টাক আর গলার কাটা দাগ। 'কি চাই?' ফিসফিসিয়ে বলল সে।

'কথা বলতে চাই,' বলল কিশোর।

'এত রাতে! এখন সময় নেই। ঘুমোতে যাব।'

'তাহলে হাজতে গিয়ে ঘুমোতে হবে, এখানে নয়,' এগিয়ে এল হ্যানসন। 'পুলিশকে ফোন করব।'

সতর্ক হয়ে উঠল হ্যারি প্রাইস। ভাবল এক মুহূর্ত। সরে জায়গা করে দিল। 'এস,' ফিসফিস করল সে। 'ভেতরে এস।'

ঘরে ঢুকল ওরা। টেবিলের ওপাশে বসে আছে একজন লোক। হালকা-পাতলা, লম্বায় পাঁচ ফুটের সামান্য বেশি হবে। হাতে তাস। বোঝা গেল, খেলা ফেলে দরজা খুলতে উঠেছে প্রাইস।

'রড মিলার, আমার বন্ধু,' পরিচয় করিয়ে দিল মিস্টার ফিসফিস। 'রড, এরা তিন গোয়েন্দা। টেরর ক্যাসলে ভূত আছে কিনা তদন্ত করছে। তো, ছেলেরা, ভূত-টুত দেখেছ কিছু ক্যাসলে?'

'হ্যাঁ,' বলল কিশোর। 'টেরর ক্যাসল রহস্য সমাধান করে ফেলেছি।'

কিশোরের আত্মবিশ্বাস দেখে অবাক হল মুসা আর রবিন। সত্যিই কি সমাধান করে ফেলেছে?

'তাই নাকি?' বলল মিস্টার ফিসফিস। 'তা রহস্যটা কি?'

'আপনারা দু'জন,' বলল কিশোর। 'হ্যাঁ, আপনারা দু'জনই টেরর ক্যাসলের ভূত। ভুতুড়ে করে রেখেছেন বাড়িটাকে। কয়েক মিনিট আগে আমাকে আর মুসাকে আপনারাই ধরে বেঁধেছেন। মরার জন্যে ফেলে রেখে এসেছেন অন্ধকার সেলে।'

ভুরু কুঁচকে গেছে প্রাইসের। ভাব দেখে মনে হল ধরে মারবে কিশোরকে।

হাতুড়ির হাতলে আঙুল চেপে বসল হ্যানসনের।

'খুব সাংঘাতিক অভিযোগ, খোকা,' বলল মিস্টার ফিসফিস। 'কিন্তু প্রমাণ করতে পারবে না।'

মুসারও তাই ধারণা, প্রমাণ করতে পারবে না কিশোর। হ্যারি প্রাইস কিংবা মিলার নয়, তাদেরকে বেঁধেছে দুই আরব দস্যু। সঙ্গে ছিল এক বুড়ি জিপসি আর একটা ইংরেজ মেয়ে।

'নিশ্চয় পারব,' জোর গলা কিশোরের। 'পায়ের জুতো দেখুন না। আমাকে বাঁধার সময়ই এঁকে দিয়েছি।'

চমকে উঠল প্রাইস আর মিলার। চোখ চলে গেল জুতোর দিকে। অন্যেরাও তাকাল।

চকচকে কালো চামড়ার জুতো। দু'জনেরই ডান পায়ের জুতোর মাথার কাছে সাদা চকে আঁকা '?'। তিন গোয়েন্দার ট্রেডমার্ক।

আঠারো

হ্যারি প্রাইস আর রড মিলার তো বটেই, মুসা, রবিন এমনকি হ্যানসনও অবাক হয়ে গেছে।

'কিন্তু…,' শুরু করেই থেমে গেল মুসা।

'বুঝতে পারলে না?' মুসার দিকে চেয়ে বলল কিশোর। 'মেয়েমানুষের পোশাক আর উইগ পরেছিল ওরা। আমাকে বাঁধার সময় ছুঁয়ে দেখেছিলাম। তখনই বুঝেছি, পুরুষের বুট। বুঝলাম, ছদ্মবেশ ধরেছে। পাঁচজনকে একবারও একসঙ্গে দেখিনি। তারমানে, দু'জনেই পাঁচজনের অভিনয় করেছে। এক কুমিরের ছানা সাতবার দেখানর মত, অনেকটা।'

'তারমানে…দুই আরব, দুই মহিলা আর এক আলখেল্লাঅলা, সব ওই দু'জনেরই কাণ্ড!' তাজ্জব হয়ে গেছে মুসা।

'ঠিকই বলেছে ও,' কিশোরের আগেই জবাব দিল হ্যারি প্রাইস। 'তোমাদের ভয় দেখাতে বার বার চেহারা বদলেছি। তবে, ক্ষতি করার কোন ইচ্ছে ছিল না আমাদের। বাঁধন খুলে দেবার জন্যেই আবার ফিরে গিয়েছিলাম। কিন্তু তোমাদের বন্ধুরা দেখে ফেলল। তাড়া খেয়ে ফিরে এসেছি।'

'আমরা খুনী নই,' বলল বেঁটে লোকটা, রড মিলার। 'পাগলারও না। ভূতও না। যা করেছি, সব তোমাদেরকে ভয় পাওয়ানর জন্যে।' মুখ টিপে হাসল সে।

'তবে আমি খুনী,' গম্ভীর দেখাচ্ছে প্রাইসকে। 'জন ফিলবিকে আমিই খুন করেছি!'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক,' এমন ভাবে বলল মিলার, যেন ভুলেই গিয়েছিল কথাটা।

'তবে বিশেষ কিছু এসে যায় না তাতে।'

'পুলিশের হয়ত এসে যাবে,' বলল হ্যানসন। কিশোরের দিকে চেয়ে বলল, 'চলুন আমরা যাই। পুলিশকে খবর দেই গিয়ে।'

'দাঁড়ান দাঁড়ান,' হাত তুলে বাধা দিল প্রাইস। 'একটু সময় দিন আমাকে। জন ফিলবির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি আপনাদের।'

'জন ফিলবির ভূতের সঙ্গে তো?' ভুরু কুঁচকে গেছে মুসার।

'ভূতই বলতে পার। ও নিজেই বলবে, তাকে কেন খুন করেছি আমি।'

আর কিছু কেউ বলার আগেই ঘুরে হাঁটতে শুরু করল ফিলবি। পাশের ঘরে চলে গেল।

তাড়াতাড়ি পা বাড়াল সেদিকে হ্যানসন।

'থামুন থামুন,' বাধা দিল মিলার। 'ভয় নেই, পালাবে না। মিনিট খানেকের ভেতরেই ফিরে আসবে। হ্যাঁ, কিশোর পাশা, এই যে নাও, তোমার ছুরি।'

'থ্যাংক্যু,' বলল কিশোর। আট ফলার ছুরিটা নিয়ে কোমরের বেল্টে আটকাল।

ঠিক এক মিনিট পরেই দরজায় এসে দাঁড়াল লোকটা। না, মিস্টার ফিসফিস নয়। তার চেয়ে বেঁটে, কিছু কম বয়েসী একজন লোক। পরিপাটি করে আঁচড়ানো ধূসর চুল। পরনে টুইডের জ্যাকেট। মুখে হাসি।

'গুড ইভনিং,' বলল লোকটা। 'আমি জন ফিলবি। আমাকে নাকি দেখতে চাও?'

মিলার ছাড়া আর সবাই হাঁ করে চেয়ে আছে। একেবারে চুপ। এমন কি কিশোরও চুপ হয়ে গেছে।

মিটি মিটি হাসছে মিলার। বলল, 'ও সত্যিই জন ফিলবি।'

হঠাৎই ব্যাপারটা বুঝে ফেলল কিশোর। মুখ দেখে মনে হল, পোকা গিলে ফেলেছে। 'আপনি জন ফিলবি, আপনিই হ্যারি প্রাইস, মিস্টার ফিসফিস, তাই না?'

'মিস্টার ফিসফিস!' চেঁচিয়ে উঠল মুসা। 'তা কি করে হয়! মিস্টার প্রাইসের চেয়ে বেঁটে, চুল আছে...'

'কিশোর ঠিকই বলেছে,' পকেট থেকে একটা উইগ বের করে পরে ফেলল ফিলবি। আবার মাথা টাক হয়ে গেল তার। বুক চিতিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল, লম্বা দেখাল একটু। হঠাৎ ফিসফিসে গলায় চেঁচিয়ে উঠল, 'একটু নড়বে না! প্রাণের ভয় থাকলে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাক!'

চমকে উঠল তিন গোয়েন্দা, হ্যানসনসহ। পরক্ষণেই বুঝল ব্যাপারটা। নিজেকে মিস্টার ফিসফিস প্রমাণ করল ফিলবি। অবাক হল তিন গোয়েন্দা, লোকটা কত বড় অভিনেতা, বুঝল এখন।

পকেট থেকে কি যেন একটা বের করল ফিলবি। প্লাস্টিক তৈরি। গলায় লাগিয়ে দিতেই গভীর কাটা দাগ হয়ে গেল। 'ছেলেরা, বুঝতে পেরেছ তো এবার?

জন ফিলবিকে হ্যারি প্রাইস বানিয়ে ফেলা কিছুই না। গলার স্বর বদলে ফেলি। কথা বলি ভয়ানক ফিসফিসে গলায়। কেউ ঘুণাক্ষরেও কল্পনা করতে পারে না, আমিই জন ফিলবি।'

গলার নকল দাগ আর মাথার উইগটা খুলে আমার পকেটে রেখে দিল ফিলবি। 'এস, বস সবাই। তারপর বল, কে কি জানতে চাও। তবে, আগে আমিই বলে নিচ্ছি কিছু,' টেবিলে রাখা ছবিটা দেখিয়ে বলল, 'দেখছ, মিস্টার ফিসফিসের সঙ্গে হাত মেলাচ্ছি আমি। কি করে করলাম? খুব সহজে। ফটোগ্রাফির একটা কৌশল। অনেক বছর আগে, ছবিতে যখন অভিনয় করতাম, গলার স্বর খুব খারাপ ছিল। তোতলাতাম। লোকের সঙ্গে কথা বলতেই লজ্জা লাগত। আশ্চর্য লোকের স্বভাব! এটাকেই দুর্বলতা ধরে নিল ওরা। ঠকাত। অনেক ভেবে চিন্তে শেষে নিজেকে মিস্টার ফিসফিস বানিয়ে নিলাম। ভয় পাওয়ানর মত চেহারা। গলায় কাটা দাগ দেখে ধরেই নিল লোকে, লোকটা ডাকাত-ফাকাত গোছের কিছু। তার ওপর ভয়ঙ্কর ফিসফিসে গলা। বুঝে গেলাম, হ্যারি প্রাইসকে ভয় পায় লোকে। ব্যস, তাকেই ম্যানেজারের পদটা দিয়ে দিলাম। এরপর থেকে টাকা পয়সা আদায় বা কোন কঠিন কাজ করার দরকার পড়লেই ফিসফিস সেজে হাজির হতাম লোকের সামনে। কেউ ধরতে পারেনি। লোকে জেনেছে জন ফিলবি আর হ্যারি প্রাইস আলাদা লোক। একমাত্র রড মিলার ছাড়া আর কেউ জানত না ব্যাপারটা। ও আমার মেকআপ ম্যান ছিল। ফিসফিস সাজার ফন্দিটা ওর মাথা থেকেই বেরিয়েছে,' থামল জন ফিলবি। হাসল। 'কেমন লাগছে শুনতে?'

'ভাল, ভাল,' বলে উঠল মুসা। 'বলে যান!'

'ভালই কাটছিল দিন,' বলে চলল ফিলবি। 'এই সময়ই এল টকিং-পিকচার। ভাবলাম, অভিনয়কেই বেশি গুরুত্ব দেবে লোকে। গলার স্বরে সামান্য খুঁত, সেটা মাপ করে দেবে। কিন্তু না, দিল না। ওটাকেই অস্ত্র বানিয়ে আমার মন গুঁড়িয়ে দিল। গরম লোহার শিক ঢুকিয়ে যেন খোঁচা দিয়ে দিল কলজেয়। ছেড়ে দিলাম অভিনয়। ঘরকুনো হয়ে গেলাম। এই সময়ই নোটিশ এল ব্যাংক থেকে, ঋণের দায়ে আমার বাড়ি দখল করে নেবে। ফিলবি ক্যাসল অন্যের হয়ে যাবে, ভাবতেই খারাপ লাগে আমার। বেপরোয়া হয়ে উঠলাম।' থামল একটু সে। তারপর বলল, 'ক্যাসল তৈরির সময়ই সুড়ঙ্গটা আবিষ্কার করেছি। ক্যাসল বানিয়ে শ্রমিকেরা চলে গেল। রড আর আমি ছাড়া আর কেউ জানত না এটা। সুড়ঙ্গের মাঝামাঝি একটা দরজা বানিয়ে নিলাম, তারের জাল আর সিমেন্ট দিয়ে। এখানে এই বাড়িটা বানালাম। লোকে জানল, এটা হ্যারি প্রাইসের বাড়ি। এক ঝড়ের রাতে পাহাড়ের ওপর থেকে আমার গাড়িটা ফেলে দিলাম নিচে। লোকের কাছে মরে গেল জন ফিলবি।

'ভূত-প্রেতগুলো বানালেন কখন?' জানতে চাইল কিশোর।

'শেষ ছবিটাতে অভিনয় করার সময়! ভেবেছিলাম, যেদিন ছবি মুক্তি পাবে, বন্ধুদেরকে দাওয়াত করে এনে মজা দেব। তা আর হল না। ছবি দেখে হাসাহাসি শুরু করল লোকে। মন খারাপ হয়ে গেল,' থামল ফিলবি। তারপর বলল, 'পরে খুব কাজে লেগেছে জিনিসগুলো। এমনিতেই পুরানো ধাঁচের ক্যাসল, ভেতরে অদ্ভুত সব জিনিসে ঠাসা। দেখেই গা ছমছম করে লোকের, ভয় পেতে শুরু করে। তারপর দুয়েকটা ভূত কিংবা প্রেতাত্মা সামনে হাজির হয়ে গেলে, ভিরমি খেতে নাকি থাকে শুধু,' হাসল সে। 'লোকে জানল ক্যাসলে ভূতের উপদ্রব আছে। ওরা আর ওদিকে মাড়াল না। পথটাও বন্ধ করে দিলাম পাথর ফেলে ফেলে। ক্যাসল আর বেচতে পারল না ব্যাংক। হাতে সময় পেলাম। বসে না থেকে দুষ্প্রাপ্য কাকাতুয়ার ব্যবসা শুরু করে দিলাম। কিছু টাকা জমেছে এখন আমার হাতে। আর সামান্য কিছু জমলেই ব্যাংকের টাকা পুরো শোধ করে দিতে পারতাম,' জোরে নিঃশ্বাস ফেলল ফিলবি। 'কিন্তু তোমরা বোধহয় তা হতে দিলে না!'

'মিস্টার ফিলবি,' এতক্ষণ মন দিয়ে অভিনেতার কথা শুনছিল কিশোর। 'আপনিই আমাদেরকে ফোন করেছিলেন, না? ভয় দেখাতে চেয়েছিলেন?'

মাথা ঝোঁকাল অভিনেতা। 'ভেবেছিলাম, এরপর আর ক্যাসলের ধারে কাছে আসবে না। কিন্তু সাহস অনেক বেশি তোমাদের!'

'কি করে জানলেন, সেরাতে আমরা যাব? আমাদের পরিচয় জানলেন কি করে?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

মৃদু হাসল ফিলবি 'রড মিলার, স্পাইয়ের কাজটা ওই করেছে। ব্ল্যাক ক্যানিয়নের ধারে, একটা পাহাড়ের ঢালে ছোট একটা বাংলো আছে। ওটা তার বাড়ি! নিচে থেকে সহজে লোকের চোখে পড়ে না বাড়িটা। কাছাকাছি থাকে, ক্যাসলের ওপর নজর রাখতে সুবিধে তার। তোমাদেরকে দেখেছিল। সঙ্গে সঙ্গে টেলিফোনে জানিয়েছে আমাকে,' থামল সে।

পাহাড়ের মাথায় টেলিভিশন এরিয়্যাল কে বসিয়েছে, বুঝতে আর অসুবিধে হল না তিন গোয়েন্দার।

'কিন্তু আমাদের নাম জানলেন কি করে?' আবার জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'বলছি,' হাত তুলল ফিলবি। 'কাগজে পড়েছি রোলস রয়েস প্রতিযোগিতার কথা। ব্ল্যাক ক্যানিয়নে গাড়িটাকে দেখল রড। আমাকে জানাল। তাড়াতাড়ি গিয়ে ঢুকলাম ক্যাসলে। ভয় দেখিয়ে তাড়ালাম তোমাদেরকে। সত্যি, ভয় পেতে দেরি করেছ তোমরা। আরও অনেক আগেই ভয় পেয়ে পালিয়েছে অন্যেরা। যাই হোক, তারপর ফিরে এলাম এখানে। টেলিফোন গাইডে খুঁজলাম তোমার নাম নেই। ধরেই নিলাম, টেলিফোন নেই তোমার। তবু শিওর হবার জন্যে ফোন করলাম ইনফরমেশনে। ওরা জানাল, আছে। আর কি? পেয়ে গেলাম নাম্বার।'

'অ,' মাথা চুলকাচ্ছে কিশোর। 'ওটকিকেও নিশ্চয় দেখেছিলেন মিস্টার মিলার?'

'শুটকি!' অবাক চোখে তাকাল ফিলবি।

'আমরা ছাড়াও আরও দুটো ছেলে এসেছিল। একজন রোগা-পাতলা ঢ্যাঙা। নীল একটা স্পোর্টস কার নিয়ে এসেছিল...'

'ও হ্যাঁ হ্যাঁ। শুটকি। ভাল নাম দিয়েছ!' হাহ্ হাহ্ করে হাসল ফিলবি।

উসখুস করছে রত মিলার। শেষে বলেই ফেলল, 'একটা খুব খারাপ কাজ করে ফেলেছিলাম সেদিন। আরেকটু হলেই সর্বনাশ হয়ে গেছিল! ওই যে পাথরের ব্যাপারটা। ক্যাসলের ওপরে পাহাড়ের মাথায় আমিই লুকিয়ে ছিলাম। সেদিন ওখানে বসেই নজর রাখছিলাম তোমাদের ওপর। কতগুলো পাথরের আড়ালে ছিলাম। হঠাৎ পা লেগে হড়কে গেল একটা পাথর। চমকে উঠলাম। নিচে রয়েছ তোমরা। কি হল, দেখার জন্যে উঁকি দিলাম। আমাকে দেখে ফেললে তোমরা। ধরার জন্যে উপরে উঠতে লাগলে। লাফিয়ে সরে এসে ছুটলাম। কয়েকটা পাথর গড়িয়ে গিয়ে ধাক্কা লাগল আলগা পাথরের স্তূপে। ব্যস, নামল পাথর ধস। ওই জায়গাটাই এমন। তোমরা আটকে গেলে গুহায়। তাড়াতাড়ি নেমে গিয়ে গুহার বাইরে দাঁড়ালাম। কি করব না করব, দিশেহারা হয়ে পড়েছিলাম। ধরেই নিয়েছিলাম, চ্যাপ্টা হয়ে গেছ তোমরা। মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছিলাম ওখানেই। পাথরের ফাঁক গলে লাঠির মাথা বেরোতে দেখে কি যে খুশি লেগেছিল, বলে বোঝাতে পারব না,' থামল সে।

'গুহাটা না থাকলেই তো খতম করে দিয়েছিলেন!' গোমরা মুখে বলল মুসা।

'সত্যি বলছি,' বলল মিলার। 'ইচ্ছে করে ফেলিনি। ওটা নিতান্তই দুর্ঘটনা...'

এরপর আর কোন কথা চলে না। চুপ করে গেল মুসা।

নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে কিশোর। হঠাৎ মুখ তুলে বলল, 'কিন্তু কয়েকটা ব্যাপার পরিষ্কার হচ্ছে না এখনও!'

'কি ব্যাপার?' জানতে চাইল ফিলবি।

'আপনার সঙ্গে যেদিন দেখা করলাম,' বলল কিশোর। 'মিছে কথা বলেছেন। ঝোপ পরিষ্কার করেননি, অথচ বলেছেন করছিলেন। কেন? টেবিলে লেমোনেড রেডি রেখেছিলেন। কি করে জানলেন আমরা যাব?'

হাসল অভিনেতা, 'কি করে জানলাম? গুহা থেকে বেরোলে তোমরা। গাড়ি পর্যন্ত তোমাদেরকে অনুসরণ করে গিয়েছিল মিলার। বেশ জোরেই শোফারকে আমার এ-জায়গাটার নাম বলেছিলে। পাথরের আড়ালে লুকিয়ে শুনেছিল মিলার। খবর দিল আমাকে। লেমোনেড রেডি করলাম। জানালায় দাঁড়িয়ে দেখলাম, রোলস রয়েসটা আসছে। একটা মাচেটে নিয়ে চট করে গিয়ে ঢুকে পড়লাম একটা ঝোপে। হঠাৎ নাটকীয় ভাবে বেরিয়ে এসে, চমকে দিতে চেয়েছিলাম তোমাদেরকে। চাপ সৃষ্টি করতে চেয়েছিলাম স্নায়ুর ওপর। তারপর শোনালাম টেরর ক্যাসলে ভূত আমদানি করার কাহিনী,' হাসল ফিলবি। 'মুসা কিন্তু সত্যিই

ভয় পেয়ে গিয়েছিল।'

চট করে আরেক দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিল মুসা।

'তোমাদেরকে ক্যাসল থেকে দূরে রাখার অনেক চেষ্টা করেছি,' আবার বলল ফিলবি। 'কিন্তু পারলাম না। বড় বেশি একরোখা ছেলে তোমরা। বেশি বাড়াবাড়ি করতে গিয়ে আজ ধরাই পড়ে গেলাম। এতই তাড়াহুড়ো করেছি, সুড়ঙ্গ মুখের দরজা বন্ধ করতে ভুলে গেছি। পাখিগুলো গিয়ে ঢুকল সুড়ঙ্গে। আরও ফাঁস করে দিল ভূতের পরিচয়।'

আবার ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর। 'জিপসি বুড়ি সেজে কে গিয়েছিলেন? নিশ্চয় আপনার বন্ধু, মিস্টার মিলার?'

'হ্যাঁ। ভয় দেখাতে চেয়েছিলাম তোমাদেরকে,' বলল ফিলবি।

'ভয় পাইনি, বরং কৌতূহল আরও বেড়ে গিয়েছিল। সন্দেহও বাড়ল। বুঝলাম, ভূত নয়, টেরর ক্যাসলে মানুষের বাস আছে। সেটা আরও স্পষ্ট করে দিল রবিনের তুলে আনা ছবি। আর্মার সুটে মরচে নেই, লাইব্রেরির বইয়ে ধুলো নেই। তার মানে, কেউ একজন নিয়মিত পরিষ্কার করে রাখে ওগুলো। কে? কার এত দরদ জিনিসগুলোর জন্যে? আন্দাজ করলাম, একজনেরই হতে পারে। সে আপনি, মিস্টার ফিলবি।...তবে, আজ রাতে কিন্তু বোকাই বানিয়ে ফেলেছিলেন। আরব দস্যু সেজে। স্মাগলাররা ক্যাসলটাকে ঘাঁটি বানিয়েছে, প্রায় বিশ্বাসই করে ফেলেছিলাম।'

'হ্যাঁ, ঠিকই অনুমান করেছিলে। আমিই পরিষ্কার করি জিনিসপত্রগুলো। আর কিছু জানার আছে?'

'অনেক!' বলে উঠল মুসা। 'জানতে চাই, জলদস্যুর ছবিটা সত্যিই কি চোখ টিপেছিল?'

'আমি টিপেছিলাম,' বলল ফিলবি। 'ছবিটার পেছনের দেয়াল আসলে কাঠের তৈরি। সাদা রঙ করা কাঠের একটা বোর্ড। টেনে খুলে আনা যায়। ঠেলে দিলেই আবার বসে যায় খাপে খাপে। বোর্ডটা সরিয়ে ছবির পেছনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। চোখের পেছনে ছোট গোল প্লাস্টিকের চাকতি সরিয়ে, ওই ছেঁদায় নিজের চোখ রেখেছিলাম। তুমি চাইতেই টিপলাম।'

'কিন্তু পরে ছবিটা ভালমত পরীক্ষা করে দেখেছি। রবিনও দেখেছে। কোন ছিদ্র ছিল না চোখের জায়গায়।'

'ওটা আরেকটা ছবি। একই রকম দেখতে। তোমরা ফিরে আসবে সন্দেহ করে সরিয়ে ফেলেছিলাম আগের ছবিটা।'

'কিন্তু নীল ভূত? ওটা কি দিয়ে বানালেন?' একের পর এক প্রশ্ন করে গেল মুসা। 'অর্গানের কাঁপা ভুতুড়ে বাজনা? আয়নার ভেতরে মেয়ে ভূত? ইকো হলের ঠাণ্ডা বায়ুপ্রবাহ?'

'বলতে খারাপই লাগছে,' বলল অভিনেতা। 'রহস্যগুলো আর রহস্য থাকবে না। ঠিক আছে, তবু বলছি…'

'কয়েকটা রহস্য এমনিতেও আর রহস্য নেই,' বাধা দিয়ে বলল কিশোর। 'আমি জানি, কি করে কি করেছেন। বরফের ভেতর দিয়ে কোন ধরনের গ্যাস প্রবাহিত করেছেন। দেয়ালের গোপন কোন ছিদ্র দিয়ে ওই ঠাণ্ডা গ্যাস ঢুকিয়ে দিয়েছেন ইকো হলে। হয়ে গেল ঠাণ্ডা বায়ুপ্রবাহ। বিচিত্র বাজনা, সেই সঙ্গে চেঁচামেচি, গোলমাল সৃষ্টি করা খুব সহজ। রেকর্ডকে উল্টো ঘোরানর ব্যবস্থা করেছেন। এই উল্টো বাজনা অ্যামপ্লিফাই করে ছড়িয়ে দিয়েছেন স্পীকারের সাহায্যে। নীল ভূত বানানোও সহজ। নীল লুমিনাস পেইন্ট মাখিয়ে নিয়েছেন পাতলা অয়েল পেপারে। সুতোয় কাগজের এক মাথা বেঁধে ঝুলিয়ে দিয়েছেন ওপর থেকে। সুতো ধরে টেনে নাচিয়েছেন ওটাকে। তারপর, কুয়াশাতঙ্ক। কোন ধরনের কেমিক্যাল পুড়িয়ে সৃষ্টি করেছেন এমন ধোঁয়া। এমন কোন ধরনের কেমিক্যাল, যেটার ধোঁয়ার গন্ধ নেই। দেয়ালের গোপন ছোট ছোট ছিদ্র দিয়ে চালান করে দিয়েছেন প্যাসেজে। কি, ঠিক বলছি তো?'

'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ,' মাথা ঝোঁকাল ফিলবি। 'না, মাথায় ঘিলু আছে তোমার, স্বীকার করতেই হবে!'

'আয়নার ভূত তো আপনি নিজেই,' আবার বলল কিশোর। মেয়ে মানুষের পোশাক পরে, প্যাসেজ দিয়ে গিয়ে পাল্লা খুলে দাঁড়িয়ে পড়েছেন। তারপর সুযোগ বুঝে চট করে আবার ঢুকে গেছেন প্যাসেজে। বন্ধ করে দিয়েছেন পাল্লা। খুব সহজ। কিন্তু একটা জিনিস বুঝতে পারছি না। কোন কৌশলে লোকের স্নায়ুর ওপর চাপ ফেলেছেন আপনি। অস্বস্তি, ভয়, শেষে আতঙ্ক এসে চেপে ধরে। কি করে করলেন?'

'আরও ভাব আরও ভাব, মাথা খাটিয়ে বের করার চেষ্টা কর। শেষ পর্যন্ত না পারলে, বলে দেব। এখন এস, কিছু জিনিস দেখাচ্ছি তোমাদের।'

সবাইকে পাশের ঘরে নিয়ে এল ফিলবি। বিরাট এক ড্রেসিং রুম। নানাধরনের উইগ, পোশাক আর মেকআপের সরঞ্জাম থরে থরে সাজানো রয়েছে কয়েকটা আলমারিতে। এক পাশে বিরাট এক র‍্যাকে অনেকগুলো গোল ক্যান।

'ওগুলোতে ফিল্ম,' ক্যানগুলো দেখিয়ে বলল ফিলবি। 'আমার অভিনয় করা সমস্ত ছবির একটা করে ফিল্ম। এক সময় কোটি কোটি লোককে অনেক আনন্দ দিয়েছি। অথচ আজ আমাকে ভূত সেজে লুকিয়ে থাকতে হচ্ছে লোকচক্ষুর আড়ালে!' কেমন বিষণ্ণ গলা অভিনেতার, সবারই মন ছুঁয়ে গেল। 'তা-ও রেহাই পেলাম না। তোমরা এলে। ছদ্মবেশ খুলে ফেললে আমার। কাল সকাল থেকেই পিলপিল করে লোক আসতে থাকবে। হাসাহাসি করবে, টিটকিরি দেবে।'

কেউ কোন কথা বলল না।

'তবে, গলার স্বর নিয়ে আর কেউ হাসতে পারবে না এখন,' আবার বলল ফিলবি। 'ওষুধ খেয়ে আর প্র্যাকটিস করে করে সারিয়ে ফেলেছি আমি।'

নিচের ঠোঁটে সমানে চিমটি কেটে চলেছে কিশোর।

'কিন্তু এত কষ্ট করে কি পেলাম!' অভিনেতার গলায় ক্ষোভ। 'আবার আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করবে লোকে। ক্যাসলটা আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেবে ব্যাংক। এবার হয়ত সত্যিই আত্মহত্যা করতে হবে আমাকে!'

'মিস্টার ফিলবি,' হঠাৎ বলল কিশোর, 'ওই ক্যানগুলোতে আপনার অভিনীত সমস্ত ছবি আছে, না?'

'হ্যাঁ। কোথাও ভূত সেজেছি আমি, কোথাও দানব, কোথাও জলদস্যু...'

'নির্বাক ছবির যুগ তো অনেক আগেই শেষ। তারমানে অনেকদিন থেকেই পড়ে আছে। আর কোন হলে দেখানো হচ্ছে না এখন।'

'না, হচ্ছে না। সবাক ছবি ফেলে নির্বাক ছবি কেন দেখবে লোকে? কিন্তু এসব কথা কেন?'

'মনে হচ্ছে, আপনার ক্যাসল আপনারই থাকবে। একটা বুদ্ধি এসেছে মাথায়। আগামী কাল জানাব আপনাকে। আর হ্যাঁ, এখান থেকে কোথাও যাবেন না। ভয়ের কিছু নেই। আপনিই টেরর ক্যাসলের ভূত, কথাটা এখনই ফাঁস করছি না আমরা। অনেক রাত হল। আচ্ছা চলি। কাল দেখা হবে।'

সুড়ঙ্গ পথেই আবার ক্যাসলে ফিরে এল ওরা—তিন গোয়েন্দা আর হ্যানসন। বেরিয়ে এল ক্যাসল থেকে।

আজ আর ভূতের ভয় নেই। ধীরেসুস্থে নেমে এল পথে। রোলস রয়েছে উঠল।

উনিশ

পরদিন সকালে আবার হলিউডে রওনা হল দুই গোয়েন্দা, কিশোর আর মুসা। রবিন আসতে পারেনি। কাজের চাপ বেশি। লাইব্রেরিতে চলে গেছে।

প্যাসিফিক স্টুডিওর ফটকে এসে থামল রোলস রয়েস। আজ আর কোন অসুবিধে হল না। কেরি ওয়াইল্ডার জানে ওরা আসছে, জানিয়ে রেখেছে গার্ডকে। খুলে গেল দরজা। ভেতরে ঢুকে পড়ল রোলস রয়েস।

কয়েক মিনিট পরেই মিস্টার ক্রিস্টোফারের অফিসে এসে ঢুকল দুই গোয়েন্দা।

'এসে গেছ। বস,' ভারি গলা পরিচালকের, 'তারপর? কি খবর?'

'ভূতুড়ে বাড়ি খুঁজে পেয়েছি, স্যার,' বসতে বসতে বলল কিশোর।

'তাই নাকি?' ভুরু কোঁচকালেন পরিচালক। 'কি ধরনের ভূত?'

'ধরন ঠিক করা কঠিন,' বলল কিশোর। 'আসলে ভূতুড়ে করে রেখেছিলেন

একজন মানুষ। মরা নয়, জ্যান্ত।'

'তাই! মজার ব্যাপার!' চেয়ারে হেলান দিলেন মিস্টার ক্রিস্টোফার। 'খুলে বল তো, সব।'

চুপচাপ সব শুনলেন পরিচালক। তারপর বললেন, 'জন ফিলবি বেঁচে আছে জেনে ভালই লাগছে। এককালের মস্ত অভিনেতা, কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু একটা ব্যাপার তো বললে না। নার্ভাস করত কি করে লোককে?'

'গতরাতে মিস্টার ফিলবির ওখান থেকে ফিরে অনেক ভেবেছি, স্যার। শেষে বুঝে ফেলেছি ব্যাপারটা। পাইপ অর্গান।'

'পাইপ অর্গান!'

'হ্যাঁ, স্যার। চাচার বুক শেলফে অর্গানের ওপর একটা বই আছে। এক জায়গায় লেখা আছেঃ সাবসোনিক ভাইব্রেশন অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া করে মানুষের স্নায়ুর ওপর। এক ধরনের চাপ সৃষ্টি করে। প্রথমে অস্বস্তি বোধ শুরু হয়। বাড়তে থাকে অস্বস্তি, তারপর ভয়, এবং সব শেষে আতঙ্কিত করে তোলে।'

'বুদ্ধি আছে লোকটার!' বললেন পরিচালক, 'কিন্তু, ভুতুড়ে ক্যাসলের ভূতকে লোকের সামনে বের করে আনাটা কি উচিত হবে? একেবারে ধ্বংস হয়ে যাবে ফিলবি।'

'এখন একমাত্র আপনিই বাঁচাতে পারেন ওঁকে,' বলল কিশোর।

'আমি?'

'হ্যাঁ, স্যার, আপনি। ওঁর সমস্ত নির্বাক ছবিকে সবাক করে তুলতে পারেন। কণ্ঠ উনিই দিতে পারবেন এখন। গলায় আর কোন দোষ নেই। প্রচুর আয় হবে। ক্যাসলটা আবার কিনে নিতে পারবেন মিস্টার ফিলবি। এতদিন ভূত সেজে মানুষকে কি করে ভয় দেখিয়েছেন, প্রকাশিত হবে খবরের কাগজে। লোকে দেখতে আসবে টেরর ক্যাসল। ভেতরের অদ্ভুত সব কাণ্ডকারখানা পয়সার বিনিময়ে দেখাতে পারবেন তিনি। বেশ ভালই আয় হবে ওখান থেকেও। মস্ত বড় একটা প্রতিভাকে প্রায় ধ্বংস করে দিয়েছিল লোকে, না বুঝে। এতগুলো বছরে অনেক ক্ষতি হয়ে গেছে তাঁর, তবে আপনি সাহায্য করলে পুষিয়ে নিতে পারবেন কিছুটা।'

'হুমমম!' হালকা পাতলা ছেলেটার দিকে চেয়ে আছে মিস্টার ক্রিস্টোফার। 'তোমার অনুরোধ আমি রাখব, কিশোর পাশা, কথা দিলাম।'

'থ্যাঙ্ক ইউ, স্যার, থ্যাঙ্ক ইউ!' খুশি হয়ে উঠল কিশোর। 'মিস্টার ফিলবির অভিনীত ছবিগুলো এবার দেখতে পাব।'

'হ্যাঁ, এবার দেখতে পাব,' বলল পাশে বসা মুসা।

'হ্যাঁ, ভাল কথা, অনেক খোঁজ-খবর করেছি আমি,' বললেন মিস্টার ক্রিস্টোফার। 'কিন্তু সত্যি সত্যি কোন ভুতুড়ে বাড়ি নেই কোথাও। গুজব থাকে,

ভূত আছে ভূত আছে। কিন্তু ভালমত খোঁজখবর করলেই বেরিয়ে পড়ে অন্য কিছু। যাই হোক, ওই প্রোজেক্ট বাদ দিতে হচ্ছে আমার।'

'তাহলে কি…' সামনে ঝুঁকল কিশোর।

হাত তুললেন মিস্টার ক্রিস্টোফার। 'আগে শোন সব কথা। কথা দিয়েছিলাম, তোমাদের নাম প্রচার করব। ব্যবস্থাটা আসলে তোমরাই করে দিলে। চমৎকার এক গল্প হবে, সত্যি ঘটনার ওপর ভিত্তি করে। টেলিভিশনের জন্য যদি একটা ফিল্ম তৈরি করি? নাম দিইঃ মিস্টার ফিলবি অভ টেরর ক্যাসল, কেমন হয়?'

প্রায় লাফিয়ে উঠল কিশোর আর মুসা। হাততালি দিয়ে উঠল। চেঁচিয়ে উঠল, 'খুব ভাল হয়, স্যার, খুব ভাল!'

'হ্যাঁ, আরেকটা ব্যাপার। তোমাদের মাঝে সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছি আমি। গোয়েন্দা হিসেবে ভালই নাম করতে পারবে। চালিয়ে যাও। দরকার হলে আমিও সাহায্য করব তোমাদের।'

খুশিতে ধেই ধেই করে লাফানো বাকি রাখল শুধু দুই গোয়েন্দা।

কিশোর বলল, 'আমরা যাই, স্যার। রবিনকে খবরটা দিতে হবে।'

ঘর থেকে প্রায় ছুটে বেরিয়ে এল দুই কিশোর। পেছনে তাকালে, দেখতে পেত, সারাক্ষণ সদা-গম্ভীর চিত্র-পরিচালকের মাঝেও সংক্রমিত হয়েছে তাদের আনন্দ। কুৎসিত ঠোঁটে ফুটেছে নিষ্পাপ সুন্দর এক চিলতে হাসি।

-০-

তিন গোয়েন্দা সিরিজ

তিন গোয়েন্দা

রকিব হাসান

Scanned by: Shabab Mustafa

Send your feedback at:
Shabab.mustafa@gmail.com